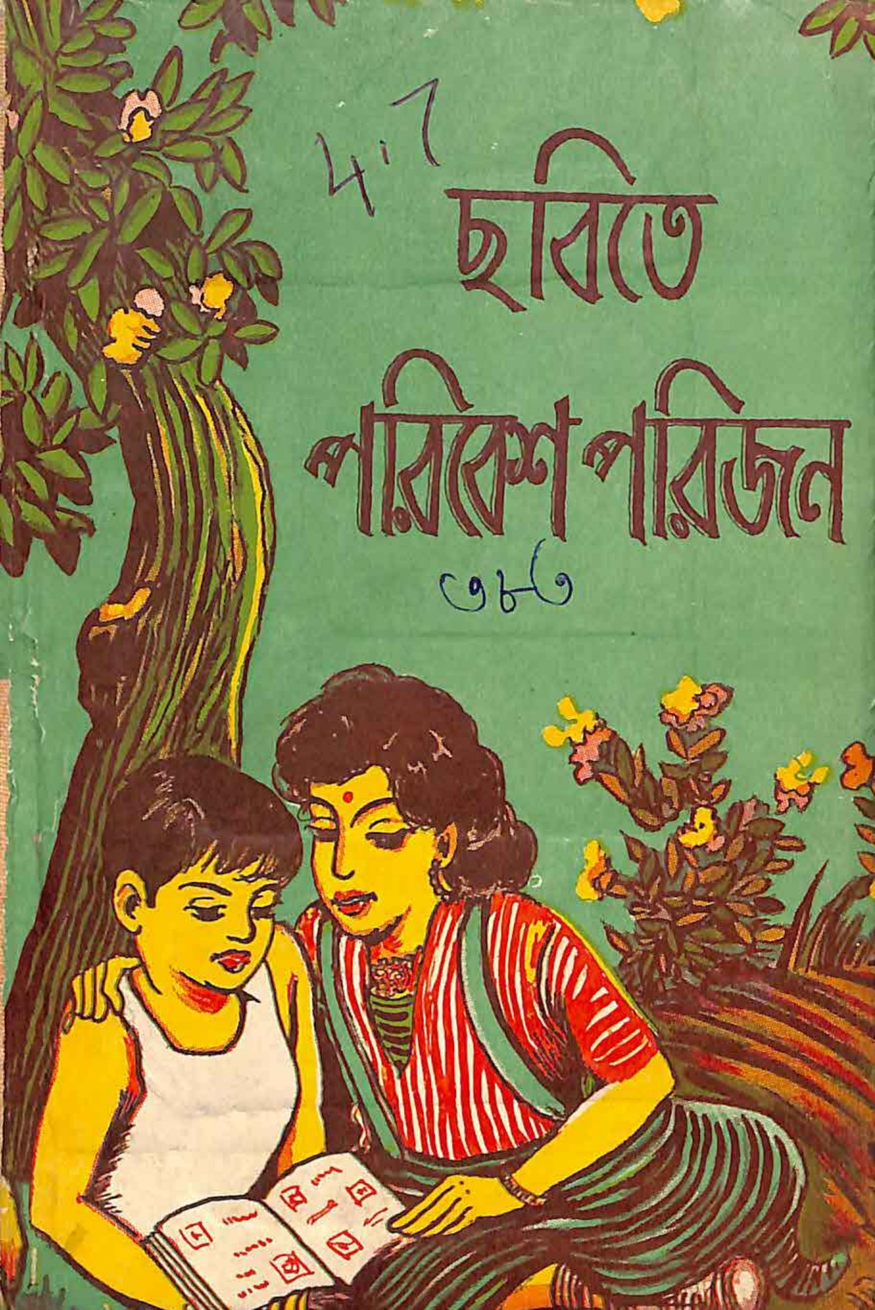

ছবিতে
পরিবেশ পরিজন

ছবিতে পরিবেশপরিজন

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

এই পৃথিবী, ভারতের কথা ও কাহিনী, অথ ভারত কথকতা, ভয়ংকরের জীবন কথা, নব ছবি ও কথা ১ম/২য় ভাগ, ছবি ও কথা ১ম/২য় ভাগ, যুগে যুগে ভারত প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা।

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

দাম ৮·০০

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত ॥

বিষয়-সূচী

ভূগোল

বিষয় পৃষ্ঠা

গোড়ার কথা ... ... ১—৫
পাড়াগাঁয়ের পরিবেশ, শহরের পরিবেশ, আমাদের নানা পরিজন।

আমাদের পরিজন ... ... ৬—১১
চাষী, জেলে, গোয়ালা, মুদি ও দোকানদার, কুমোর, পুলিস, চৌকিদার, পিয়ন, ডাক-হরকরা।

গ্রামের কথা ... ... ১২—১৩
গ্রামবাসীদের পরিচয়, হাট-বাজার, হাট ও বাজারে তফাত, মালপত্র আমদানি, বড় হাট।

যানবাহন ... ... ১৪—১৯
গরুর গাড়ি ও মোষের গাড়ি, নৌকা, স্টীমার, রেলগাড়ি, বাসগাড়ি, রিকশা গাড়ি।

পাড়া, গ্রাম, ইত্যাদি কাকে বলে? ... ... ২০—২১
পাড়া, গ্রাম, ইউনিয়ন, ইউনিয়ন বোর্ড বা ইউনিয়ন সমিতি, থানা, দারোগা, পুলিস, মহকুমা, মহকুমা শাসক, উপ-শাসক, মহকুমা সদর, জেলা, জেলা শাসক, জেলার সদর।

নদী, হ্রদ, পাহাড় ইত্যাদির ধারণা ... ... ২২—২৪
সমতল ভূমি, পাহাড় ও পর্বত, পুকুর ও দীঘি, হ্রদ, দ্বীপ, নদী, উপনদী, খাল, মোহনা, সাগর।

দিক ঠিক করা ২৫

রাত্রি ও দিনের বৈচিত্র্য ... ... ২৬—২৭
সূর্যোদয়, আকাশের রঙ, দিনের বৈচিত্র্য, সূর্যাস্ত, আকাশের রঙ, রাত্রির বৈচিত্র্য।

সূর্য চন্দ্র এবং তারকা ... ... ২৭—৩০
সূর্য, চন্দ্র বা চাঁদ, জ্যোৎস্না, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, তারকা, ছায়াপথ।

বিষয় পৃষ্ঠা

নকশা-আঁকা ... ... ৩১—৩৩
নকশা, ছবি ও নকশার তফাত, বড় জিনিসের নকশা, ফুট-কাঠি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের চেহারার পরিবর্তন
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীত, বসন্ত। ... ৩৪—৩৭

গাছপালার জীবন-কথা ... ... ৩৮—৪৪
গাছপালার জন্ম, পরীক্ষা, শিকড়, গুঁড়ি ও ডাঁটা, পাতা, ফুল, ফল।

মাছ, ব্যাঙাচি ও শামুক
মাছ, ব্যাঙাচি, শামুক। ... ... ৪৫—৪৭

শুঁয়োপোকার কথা ...
শুঁয়োপোকার জন্ম, পরিবর্তন। ... ... ৪৮—৪৯

গৃহপালিত পশুর কথা
বিড়াল, কুকুর, গরু। ... ... ৫০—৫২

আরও কয়েকটি পশুর কথা॥ গৃহপালিত ও বন্য পশু
শিয়াল, সজারু, হাতী, বাঘ, সিংহ, উট। ... ৫২—৫৭

পাখির কথা
চড়াই, কাক, শালিক। ... ... ৫৭—৬০

টুকরো সংগ্রহের বই, প্রকৃতি-পঞ্জী ও আবহাওয়া-পঞ্জী ... ৬১—৬২

।। ভূগোল অংশ ।।

গোড়ার কথা

ভারত আমাদের দেশ। আমরা ভারতে বাস করি। তাই আমরা ভারতবাসী। আমরা বাংলাদেশেও বাস করি। বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমরা তাই বাঙালী। এই বাংলা ভারতেরই একটা অংশ।

আমরা কেউ শহরে বাস করি। কেউ বাস করি পাড়াগাঁয়ে। আমাদের দেশে শহর খুবই কম। পাড়া গাঁ অনেক বেশী। তাই দেশের বেশীর ভাগ লোকই পাড়াগাঁয়ে বাস করে।

শহর ও গাঁয়ে অনেক তফাত। একটু নজর করলে তোমরাও দেখতে পাবে, শহরের চেহারা আর পরিবেশের সাথে গাঁয়ের কোনই মিল নেই। দেখবে, শহরের ঘরবাড়ি, পথঘাট, যানবাহন আর লোকজনের থেকে গাঁয়ের সবকিছু কত আলাদা।

পাড়াগাঁয়ের পরিবেশ

লোকজন—পাড়াগাঁয়ে বেশীর ভাগ লোক চাষবাস করে। কেউ কেউ আবার মাছ ধরে, তাঁত বোনে, মাটির হাঁড়ি-কলসী বানায়। এমনি আরও কত কাজ করে।

গাঁয়ের লোক সাধারণতঃ বেশ সরল ও সাদাসিধা হয়। সবাই সবাইকে চেনে। বিপদে-আপদে একে অপরের পাশে এসে

দাঁড়ায়। তাদের সাজপোষাকও হয় সাদাসিধা—বিশেষ বাহার বা জাঁকজমক থাকে না।

ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া—পাড়াগাঁয়ে জমি-জায়গা অনেক বেশী। লোকজনের বসতি বা ঘর-বাড়ি তাই সব ফাঁকা ফাঁকা, দূরে দূরে। পাড়াগাঁয়ে বেশীর ভাগ লোক গরীব। তাই অধিকাংশ



গ্রামের বাড়ী ঘর

বাড়িতেই খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর বা টিনের ঘর। কোন কোন গাঁয়ে অনেক দালানকোঠাও দেখা যায়। যাদের বেশ টাকাপয়সা আছে, তারাই শুধু দালানকোঠায় বাস করে।

পথঘাট, মাঠ, গাছপালা—গাঁয়ের বেশীর ভাগ পথঘাট সব কাঁচা-মাটির তৈরী। অনেক গাঁয়ে পাকা সড়কও আছে। সেখানে গাড়ি-ঘোড়া খুবই কম চলাচল করে। হৈ-চৈ গোলমাল খুবই কম। কোনও কাজে কোথাও যেন তাড়া নেই। লোকজন, কাজকারবার, সবকিছুই চলে ধীর গতিতে।

পাড়াগাঁকে মনে হয় যেন ছায়ায় ঢাকা। সেখানে আছে আম, জাম, তাল, নারিকেল, সুপারি এবং আরও কত ফুল-ফলের বাগান। সে সব গাছে রঙ-বেরঙের ফুল ফোটে, ফল ধরে। শাক-সবজি ও ফসলের বড় বড় ক্ষেত আর বড় বড় মাঠে নানারকম

ফসল ফলে। মাঠে গরু, মোষ, ছাগল চরে। অনেক গাঁয়ের পাশে খাল-বিল-নদী-নালাও দেখা যায়। হরেক রকম রঙ-বেরঙের পাখির ডাকে ও গানে পাড়াগাঁ মুখরিত হয়। ঝোপে-ঝাড়ে, গাছে গাছে বাসা বেঁধে বাস করে দোয়েল, শালিক, ময়না, টিয়া, কাক, কোকিল, ফিঙে, ঘুঘু, প্যাঁচা, বুলবুল, বাবুই, এমনি আরও কত রকমের পাখি। বনে-বাদাড়ে বাস করে নানা রকম পশু, আর বুনো জানোয়ার।

যাতায়াতের সুবিধা থাকায় নদী বা খালের ধারে বড় বড় গাঁ গড়ে ওঠে। বর্ষাকালে গাঁয়ের পথে কাদা হয়, জল জমে জায়গায় জায়গায়। মাঠ-ঘাট-বিল-পুকুর-খানা-ডোবা—সব জলে ভরে যায়। নদী ও খালের জল ঘোলা হয়, কূলে কূলে ছাপিয়ে ওঠে। দিনরাত ব্যাঙের ডাকে কান পাতা দায় হয়। নদী-খাল-বিলে মাছ মেলে খুব। জেলেরা মাছ ধরে। বিলের জলে শাপলা, পানিফল, কলমি হয়।

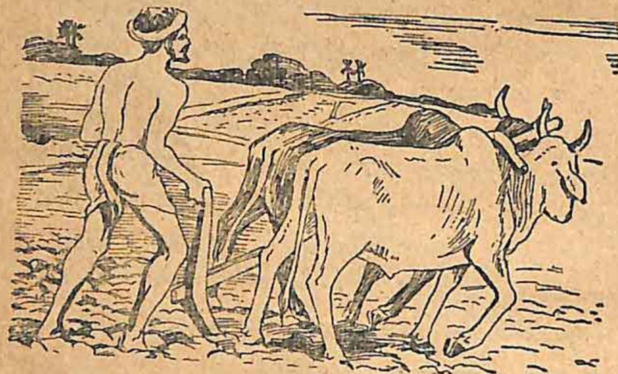
পাড়াগাঁয়ের এই সব কিছু মিলে হয় **গাঁয়ের পরিবেশ**। গাঁয়ের পরিবেশ থেকে **শহরের পরিবেশ** আবার একেবারেই পৃথক।

শহরের পরিবেশ

লোকজন—শহরে খুব কম জায়গায় খুব বেশী লোক বাস করে। সেখানে ঘরবাড়ি সব তৈরী হয় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে। মানুষের বসতি সেখানে খুব ঘন। লোকজন গিজগিজ করে। লোকজনের চেঁচামেচি, গাড়িঘোড়ার আওয়াজ, সব মিলিয়ে সব সময় হৈ-চৈ গোলমাল লেগেই থাকে। বহু দেশের বহু জাতের বহু রকমের লোক থাকে শহরে। তাদের ভাষা আলাদা, সাজ-পোষাকও আলাদা। নানা জনের পেশা সেখানে নানা রকম। কেউ অফিসে-আদালতে, কেউ কলকারখানায়, কেউ দোকানে-বাজারে, কেউ বা আর কোথাও চাকরি করে। কেউ বা কারবার করে। সেখানে পাশাপাশি এক বাড়িতে একই পাড়ায় বাস করে শত শত লোক, অথচ একজন আর একজনের বিশেষ খোঁজ-খবর রাখে না।

আমাদের পরিজন

চাষী—আমরা ভাত, ডাল, রুটি, শাক-সবজি খাই। ধান থেকে চাল হয়, আর চাল থেকে হয় ভাত। সেই রকম গম থেকে তৈরী হয় আটা, আর আটা দিয়ে রুটি। ধান, গম, ডাল-কলাই, শাক-সবজি—কে তৈরি করে এসব ফসল ? তৈরি করে চাষী। চাষীকে

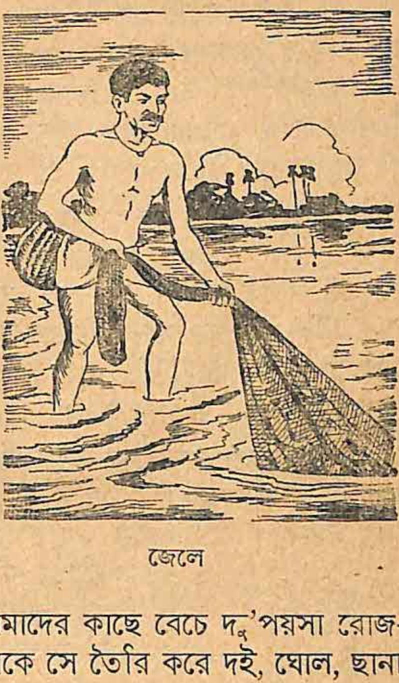


চাষী

সাধু ভাষায় বলে কৃষক। **চাষী মাঠে মাঠে সোনার ফসল ফলায়।** ধান, গম, পাট, ডাল-কলাই, সরষে, শাক-সবজি, এমনি আরও কত ফসল আমরা পাই তার কাছ থেকে। আমরা পাড় সুতোর কাপড়। কার্পাস থেকেই সুতো হয়। চাষীই তৈরি করে সেই কার্পাস গাছ। তাহলে দেখ, চাষী আমাদের কত বড় পরিজন—নিজের লোক; **চাষীই আমাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে।**

জেলে—বাঙালীর সবচেয়ে বড় খাদ্য ভাত, মাছ আর দুধ। মাছ না হলে আমাদের যেন পেট ভরে না। কে আমাদের এই মাছের যোগান দেয় ? সে জেলে। সে মাছ নিয়ে আসে হাটে-বাজারে, আমাদের বাড়িতে। **জেলে আমাদের মাছ সরবরাহ করে।**

জাল, ছিপ-বড়শি, বেড় ইত্যাদি দিয়ে নানা কায়দায় সে মাছ ধরে। রুই, কাতলা, ভেটকি, চিংড়ি, মাগুর, কই—কত রকম ছোট-বড় মাছ সে ধরে আনে নদী-নালা, খাল-বিল-পুকুর থেকে। তবেই ত আমরা মাছ পাই।



জেলে

গোয়ালা—গরুর দুধ খুব উপকারী। এ দুধ আমরা কোথা থেকে পাই? সবাই আমরা গরু পুষি না। তাহলে, কে দুধের **যোগান দেয়? সে গোয়ালা।**

গোয়ালা বাড়িতে অনেক গরু পোষে। সেই সব গরুর দুধ সে বাড়ি, হাটে-বাজারে নিয়ে আসে, আমাদের কাছে বেচে দু'পয়সা রোজগার করে। তা ছাড়া, দুধ থেকে সে তৈরি করে দই, ঘোল, ছানা, ঘি, মাখন এবং আরও কত ভাল ভাল খাবার।

মুদী ও দোকানদার—আমাদের রোজ কত জিনিসের দরকার হয়। চাল, ডাল, তেল, নুন, মরিচ, মশলা, কাপড়চোপড়, বই-খাতা, কাগজ-কলম, এমনি হাজার রকমের জিনিস আছে, যা না হলে আমাদের চলে না। এসব আমরা কোথা থেকে পাই? **এসব জিনিস আমরা কিনি মুদী বা দোকানদারের কাছ থেকে।** শহরের নানা জায়গা ঘুরে বড় বড় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ থেকে ঐসব জিনিস কিনে এনে সে দোকানে জমা রাখে। সে যদি একাজ না করত, তাহলে আমাদেরই নানা জায়গায় ঘুরে এক-একটা জিনিস কিনতে হত। তাহলে আমাদের কিরকম অসুবিধা ও হয়রানি ভোগ করতে হত, ভেবে দেখ একবার।

কুমোর—পাড়াগাঁয়ের বেশীর ভাগ বাড়িতে মাটির তৈরি হাঁড়ি-কলসী দরকার হয়। কারা তৈরি করে এসব জিনিস? **মাটি দিয়ে কুমোররাই তৈরি করে** হাঁড়ি-কলসী, সরা, কুঁজো, আরও কত কি। এগুলো তারা রোদে শুকিয়ে আগুনে পোড়ায়। জিনিসগুলো তখন বেশ মজবুত হয়। চমৎকার সব মাটির খেলনাও তারা তৈরি করে।

পুলিস—শহর হোক আর পাড়াগাঁ হোক, দেশের সব জায়গায় পুলিস আছে। মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে লাঠি পুলিস তোমরা সবাই বোধহয় দেখেছ। দেশের লোকের যাতে বিপদ না ঘটে, চুরি-ডাকাতি, মারামারি-কাটাকাটি না হয়, পুলিসের কাজ সেদিকে নজর রাখা। পুলিসরা যেখানে দল বেঁধে বাস করে তাকে বলে **থানা**। থানার ভার থাকে যাঁর উপর, তাঁকে বলে **দারোগা**।

কলকাতার মত বড় বড় শহরে পুলিসের আরও একটা জরুরী কাজ আছে।

শহরের বড় বড় রাজপথে গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন খুব বেশী চলাচল করে। বিশেষভাবে বড় বড় সড়ক যেখানে এক জায়গায় মিশেছে, সেখানে ভিড় খুব বেশী। যে কোন সময় গাড়িতে গাড়িতে ঠোকাঠুকি লাগতে পারে, লোকজন চাপা পড়তে পারে। **তা যাতে না ঘটে, তাই পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে পথের মাঝখানে**। হাত তুলে এক দিককার পথের গাড়ি-ঘোড়া, লোকজনদের চলাচল আগে সে থামিয়ে দেয়। তারপর তার বাঁশীর আওয়াজ শুনে অপর দিককার পথের গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন চলতে থাকে। ফলে ঠোকাঠুকি বাধবার ভয় থাকে না। এদের **পথ-পুলিস** বা **ট্র্যাফিক-পুলিস** বলে।



পুলিশ

চৌকিদার—পাড়াগাঁয়ে পুলিস শুধু থানাতেই থাকে। কাজ না থাকলে তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় না। এজন্য গ্রামে থাকে চৌকিদার। পাড়াগাঁয়ে দুপুর রাতে শোন নি চৌকিদারের হাঁক? **পাড়ায় পাড়ায় সে চৌকি দেয়, তাই তাকে বলে চৌকিদার।** গাঁ পাহারা দেওয়া, গাঁয়ের সব খবর রাখা, আর তা ঠিকমত থানায় দারোগা-পুলিসের কাছে পেঁছে দেওয়া চৌকিদারের কাজ। রাতের বেলায় হাঁক দিয়ে সে বাড়ি বাড়ি সবাইকে সজাগ ও সাবধান করে দিয়ে যায়। সবাই হুঁশিয়ার থাকে। চোর-ডাকাত তাই সহজে কিছু করতে পারে না।

পিয়ন, ডাক-হরকরা, ডাক-বাক্স

তোমাদের কত আপনার জন—হয়ত বাবা, কাকা, দাদা, দিদি, অথবা ঐ রকম আর কেউ বিদেশে দূরদেশে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁদের কাছ থেকে চিঠি আসে, টাকা আসে ডাকঘর বা পোষ্টাফিসের মারফতে।

শহর পাড়াগাঁয়ে বহু ডাকঘর আছে, যার কাজ হল—দেশের চিঠিপত্র নিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া, আর বিদেশের চিঠিপত্র এলে দেশের লোকের কাছে পেঁছে দেওয়া।



পিয়ন

পিয়ন—একজন লোক এসে সেইসব চিঠি বা টাকা তোমাদের বাড়িতে দিয়ে যায়। কাঁধে চিঠির ব্যাগ বা থলি আর হাতে চিঠির গোছা নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি সে ঘোরে। আমরা তাকে বলি পিয়ন। **পিয়নের কাজ ডাকঘর থেকে চিঠি বা টাকা বিলি করা।**

ডাক-বাক্স তোমরা সবাই দেখেছ। চিঠি লিখে সবাই সেই ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে আসে। পিয়ন এক সময়ে বাক্সের ঢাকনি খুলে চিঠিপত্র সব বের

করে নেয়। তারপর সীল মেরে থলিতে ভরে ফেলে দূরের ডাকঘরে পেঁছে দেবার জন্যে। বড় বড় ডাকঘর থেকে দূরে পাড়াগাঁয়ের ছোট ছোট ডাকঘরে চিঠি, টাকা-পয়সা ও আরো নানা ডাক যায়। ছোট ডাকঘর থেকেও তেমনি যায় বড় ডাকঘরে। সেখানে হয়ত যাতায়াতের খুব অসুবিধা, গাড়ি-ঘোড়া চলাচল করে না। তাহলে সেখানে ঐসব চিঠি ও ডাক যায় কি ভাবে?



ডাক-হরকরা

ডাক-হরকরা—এক ডাকঘর থেকে চিঠি ও আরও নানা ডাক নিয়ে যে লোক দূর দূর এলাকার ডাকঘরে পেঁছে দেয়, তার নাম ডাক-হরকরা। **ডাক আনা-নেওয়া করাই ডাক-হরকরার কাজ।** সীলমোহর করা চিঠিপত্রের থলে কাঁধে নিয়ে সে রওনা হয়। একলা ছুটে চলে সে এক ডাকঘর থেকে আর এক ডাকঘরের দিকে।

রাতের বেলায় বনবাদাড় ভেঙেও তাকে একলা চলতে হয়। তাই তার হাতেও থাকে একটা বর্শা। বর্শার মাথায় বাঁধা থাকে ঘুঙুর আর ছোট একটা আলো। একলা ডাক-হরকরা ছুটে চলে আঁধার রাতের পথ বেয়ে।

অনুশীলনী

১। পরিবেশ কাকে বলে। গাঁয়ের পরিবেশ ও শহরের পরিবেশের ভিতর তফাত দেখাও।

২। চাষী আমাদের পরিজন কেন? চৌকিদার, কুমোর, মুদী, গোয়ালা, জেলে, পুলিস, পিওন ও ডাক-হরকরা—এরা কে কি কাজ করে? ঘুঙুর-বাঁধা বর্শা কার হাতে থাকে? কেন থাকে?

৩। ভুল থাকলে ঠিক করো :—(ক) মুদী মাছ ধরে। (খ) ডাক-হরকরা পাড়া চৌকি দেয়। (গ) কুমোর বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করে। (ঘ) পুলিস হাঁড়ি-কলসী তৈরি করে। (ঙ) পিয়ন জমিতে ফসল ফলায়।

গ্রামের কথা

গ্রামবাসীদের পরিচয়

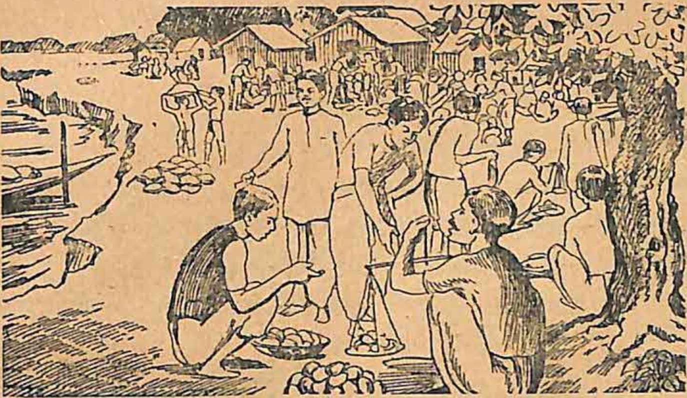
বেশীর ভাগ গ্রামে দেখবে গ্রামগুলি নানা পাড়ায় ভাগ করা। **এক এক পাড়ায় সাধারণতঃ এক এক জাতের লোক বাস করে।** কোন পাড়ায় হয়ত চাষী বা কৃষকদের বাস। সে পাড়ার নাম হয় চাষী-পাড়া। চাষবাস করা, জমিতে ফসল ফলান তাদের কাজ। কোন পাড়ায় হয়ত তাঁতীদের বাস। সে পাড়ার নাম হয় তাঁতী-পাড়া। তারা তাঁতে কাপড়, গামছা, লুঙি তৈরি করে। কোন পাড়ায় হয়ত কামাররা বাস করে। সে পাড়ার নাম কামার-পাড়া। আগুনে লোহা পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে তারা তৈরি করে নানা রকম জিনিস—দা, কোদাল, হাতা, বঁটি, ইত্যাদি। তেমনি ঘোষ-পাড়ায় গোয়ালাদের বাস। তারা দুধ, দই, মাখন ইত্যাদি তৈরি করে।

এই রকম বামুনপাড়া, বোসপাড়া, ধোপাপাড়া, নাপিতপাড়া, বারুইপাড়া, কুমোরপাড়া ইত্যাদি আরও নানা পাড়া থাকে গ্রামে। আবার এমনও অনেক গ্রাম আছে, যেখানে কেবল একই জাতের লোক বাস করে।

হাট-বাজার

যেখানে বহু লোকজন জড়ো হয়ে দরকারী জিনিসপত্র বেচাকেনা করে, তাকে হাট বা বাজার বলে। একটা গ্রামে কিংবা কয়েকটা গ্রামের মাঝখানে সুবিধাজনক জায়গায় হাট বা বাজার বসে। বলতে পার, হাট বা বাজারে তফাত কি ?

হাট ও বাজারে তফাত—বাজার রোজ বসে, হাট রোজ বসে না; সাত দিনে এক দিন, দু'দিন বা বড় জোর তিন দিন হাট হয়। বাজারের চেয়ে হাটে লোকজন, মালপত্র অনেক বেশী আমদানি হয়।



হাটবাজার

মালপত্র আমদানি—কোন একটা গ্রামে সব জিনিস তৈরী হয় না। কাছের ও দূরের সব গ্রাম থেকে নানা রকম জিনিসপত্র হাটে-বাজারে আসে বেচাকেনার জন্য। ঐ সব জিনিস কেউ আনে মাথায় করে, কেউ আনে গরুর গাড়ি বা অন্য কোন গাড়িতে করে; নদী বা খাল থাকলে, নৌকায় করেও আনে অনেকে।

বড় হাট—বড় বড় হাটের মধ্যেই আবার নানা রকম ছোট ছোট হাট বসে; যেমন—গো-হাটা, ধান-হাটা, ইত্যাদি। গো-হাটায় গরু, মেছো-হাটায় মাছ, ধান-হাটায় ধান-চাল বেচাকেনা হয়। হাটে ডাল, কলাই, সরষে, তিসি ও আরও নানা ফসল আমদানি হয়। নানা লোক নানা জিনিস নিয়ে আসে—হাঁড়ি, কলসী, গামছা, কাপড়, নানা রকম খাবার, আরও কত কি।

অনুশীলনী

১। তোমাদের গ্রামে পাড়া কয়টা? কারা কোন্ পাড়ায় বাস করে? তাদের পেশা কি?

২। হাট ও বাজারে কি তফাত? বড় বড় হাটে কি কি জিনিস আসে? তোমাদের গ্রামে হাট বা বাজার আছে কি?

যানবাহন

যানবাহন—তোমরা জান, দূরে কোথাও যেতে হলে বা মালপত্র পাঠাতে হলে, গাড়িঘোড়া, রেল, নৌকা, স্টীমার ইত্যাদির দরকার হয়। এই রকম, যাতে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়, যাতে করে জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা যায়, তাকে বলে যানবাহন। রেল, স্টীমার, গাড়ি-ঘোড়া, নৌকা ইত্যাদি, এসবকেই বলে যানবাহন।

গরুর গাড়ি ও মোষের গাড়ি—গরুর গাড়ি বা মোষের গাড়ি খুব ধীরে চলে। এসব গাড়ি দু'চাকার। দুটো গরু বা মোষ তার সামনের দিকে জোড়া হয়। তারাই গাড়ি টানে। গাড়োয়ান

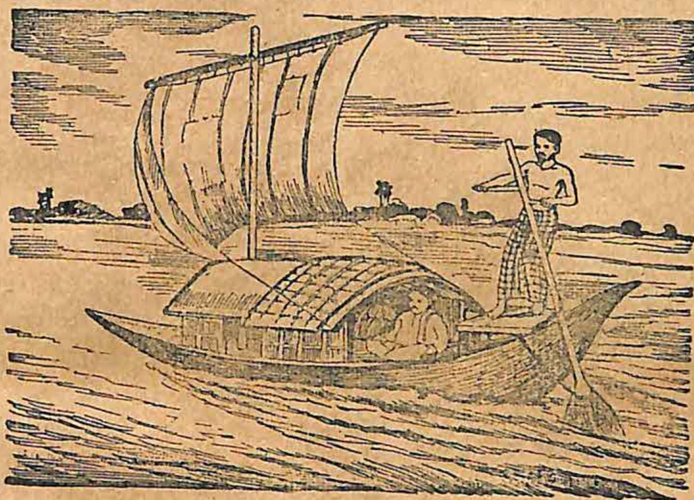


গরুর গাড়ি

তাদের চালিয়ে নিয়ে যায়। গরু বা মোষের গাড়ি বোঝাই করে জিনিসপত্র আনা-নেওয়া হয়। সময় সময় পাড়াগাঁয়ে লোকজনও যাওয়া-আসা করে গরু ও মোষের গাড়িতে।

নৌকা—পাড়াগাঁয়ে নদী-খাল-বিলে নৌকাই হল পারাপারের বা যাতায়াতের প্রধান উপায়। মাল আনা-নেওয়ার

কাজও চলে নৌকায়। নদীতে সাদা পাল তুলে ছোট-বড় নানা ধরনের কত নৌকা যাতায়াত করে। বেশী যায় ছোট নৌকা—ডিঙি আর পানসি। পানসি নৌকা সওয়ার নিয়ে যাওয়া-আসা করে। সেজন্য তাতে ছই থাকে। নদীতে খুব বড় বড় নৌকাও



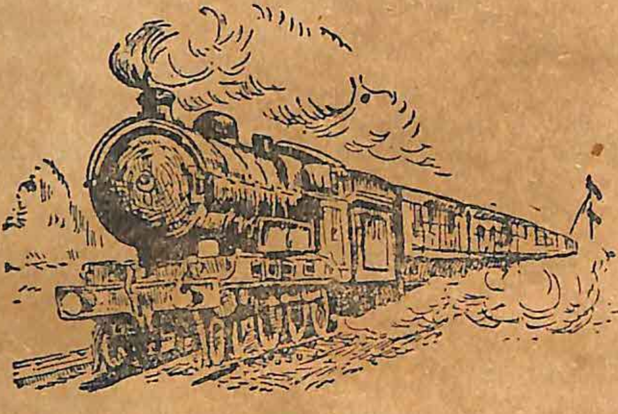
নৌকা

অনেক যাতায়াত করে। সে-সব নৌকাকে মনে হয় যেন এক-একটা বাড়ি। নৌকা যে চালায়, তাকে বলে মাঝি। মাঝিমাল্লারা হাতে দাঁড় টেনে বা বৈঠা বেয়ে নৌকা চালায়। বড় নৌকায় অনেক মাল্লা থাকে।

স্টীমার—বড় বড় নদীতে স্টীমার চলাচল করতে তোমরা অনেকেই দেখেছ। নৌকার চেয়ে স্টীমার অনেক বড়। তাই অনেক বেশী লোকজন, মালপত্র ধরে। স্টীমার ইন্‌জিনে চলে। তাই চলেও অনেক জোরে। হুইশিল বাজিয়ে বিরাট আওয়াজ করতে করতে নদী দিয়ে স্টীমার চলাচল করে। তার ঢেউয়ে

অনেক সময় ধারে-কাছের নৌকা ডুবে যায়। ছোট-বড় নানা ধরনের স্টীমার আছে। যেসব স্টীমার সমুদ্র-পথে দূর-দূর বিদেশে যাতায়াত করে, তাদের বলে **জাহাজ**। তারা আকারে বড় বড় স্টীমারের চেয়েও অনেক বড়।

রেলগাড়ি—রেলগাড়ি চড়ে গেছ কোথাও ? রেলগাড়ি খুব জোরে চলে—ঝড়ের মত বেগে, মাটি কাঁপিয়ে। তাছাড়া,



রেলগাড়ি

আওয়াজও তার সাংঘাতিক ? হুস-হুস-ঝক-ঝক-ঝকর-ঝক—একটানা আওয়াজ কানে তালা লাগে। রেলগাড়ি বড়ও সেই রকম—শেষ হয় না যেন ! লোহার শিকল দিয়ে তার কামরার পর কামরা জোড়া থাকে; কামরাগুলো এক-একখানা বড় ঘরের মত। রেলগাড়িকে ট্রেনও বলে।

রেলগাড়ির একেবারে সামনে থাকে **ইন্‌জিন্**। সামনেটা তার গোল। একখানা মাত্র ইন্‌জিন্ টেনে নিয়ে চলে অত বড় বিরাট দৈত্যের মত গাড়িখানা। রেলগাড়ির চলবার পথ একেবারেই আলাদা ধরনের। চওড়া উঁচু পথের উপর পুরু মজবুত লোহার পাটি পাতা থাকে। এই মোটা লোহার পাটির উপর

দিয়ে চলে রেলগাড়ি। এই পথকে বলে রেলপথ। আমাদের দেশের প্রায় সব জায়গায় রেলপথ গেছে। যে রেলগাড়িতে শুধু মাল পাঠানো হয়, তাকে বলে **মালগাড়ি** বা **মালট্রেন**। আর যে গাড়িতে লোকজন চলাচল করে, তাকে বলা হয় **যাত্রীগাড়ি বা যাত্রীট্রেন**।

বাসগাড়ি—তোমরা যারা শহরে থাক, তারা সবাই মোটর-গাড়ি বা বাস দেখেছ। বাসে চড়েছও অনেকে। পাড়াগাঁয়েও অনেক জায়গায় বাস চলাচল করে। বাস আছে দু'রকম—একতলা আর দোতলা। দোতলা বাসের চেহারা ছোটখাটো দোতলা বাড়ির মত। তার আওয়াজও খুব। বাস চার চাকার। বহু লোক-জন নিয়ে বাস যাতায়াত করে; তার সামনের সিটে বসে চালক গাড়ি চালায়।



বাস গাড়ী

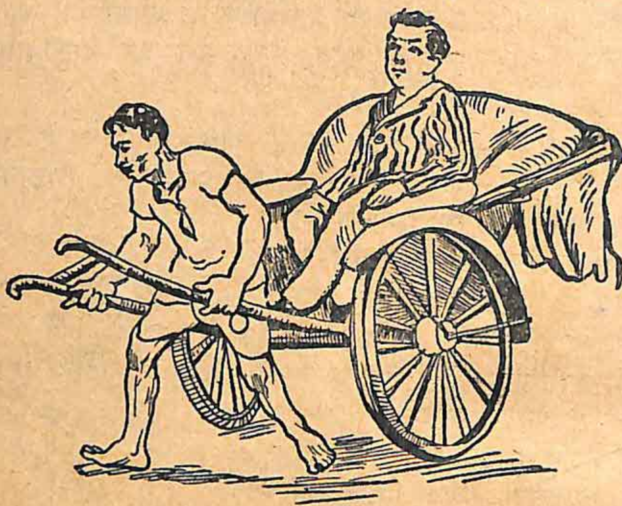
এসব গাড়ি যাত্রী নিয়ে চলে বলে, এগুলিকে বলে **বাসগাড়ি**। মালপত্র নিয়ে যেসব মোটরগাড়ি চলাচল করে, তাদের বলে **লরী**। বাস বা লরীর চেয়ে ছোট এক রকম মোটরগাড়ি আছে। তাতে করেও লোকজন যাতায়াত করে। এসব গাড়িতে ৫-৬ জনের বেশী লোক সাধারণতঃ ধরে না। কিছু মোটর গাড়ি ভাড়াও খাটে। এদের বলে **ট্যাক্সী**।



মোটর গাড়ী

রিকশা গাড়ি—রিকশায় তোমরা অনেকেই চড়েছ। কলকাতায় সাইকেল রিকশা নেই। অন্যান্য ছোট শহরে তাদের দেখা যায়। সাইকেল রিকশা তিন চাকার। তার সামনের দিকটায় সাইকেল লাগান থাকে, সাইকেলের সিটে বসে রিকশাওয়ালা রিকশা চালায়।

কলকাতায় রিকশা দু'চাকার। এসব রিকশা মানুষে টানে, পিছনের সিটে আরোহী বসে থাকে। দু'জন ঠিকমত বসতে



রিকশা গাড়ী

পারে সেখানে। রিকশাওয়ালা টেনে নিয়ে চলে গাড়িখানা। তার হাতে থাকে ঘুঙুর। চলার সময় সে ঠুং ঠাং ঘুঙুর বাজাতে থাকে।

এ ছাড়াও যানবাহনের মধ্যে **মোটর সাইকেল, সাইকেল, পালকি, ডুলি, উড়োজাহাজ** বা **এরোপ্লেন** আছে। মোটর সাইকেল বা সাইকেল যে চড়ে, সেই চালায়। পালকি বা ডুলি দেখতে বড় বাক্‌সের মতো। তার দুদিকে দরজা। আর দুপাশে লম্বা মোটা হাতল। সওয়ার বাক্‌সের মধ্যে বসে। দু-দিকের হাতল কাঁধে নিয়ে যারা পালকি-ডুলি বয়ে নিয়ে যায়, তাদের **বেহারা** বলে। বড় বড় উড়োজাহাজে অনেক লোকজন, মালপত্র চলাচল করে। যে উড়োজাহাজ চালায়, তাকে **পাইলট** বলে।

অনুশীলনী

১। যানবাহন কাকে বলে? তোমরা কোন্ কোন্ ধরনের যানবাহন দেখেছ বা চড়েছ?

২। কোন্ গাড়ি লোহার পাটির উপর দিয়ে চলে? রিকশা কয় রকমের?

৩। ভুল থাকলে সংশোধন কর :

(ক) চার চাকার গরুর গাড়ি বেশ জোরে চলে। রিকশা গাড়ি লোহার পাটির উপর দিয়ে চলে। (গ) রেলগাড়ির চেয়ে রিকশা জোরে চলে। (ঘ) স্টীমার চলে পাকা রাজপথ বা সড়ক দিয়ে। (ঙ) নৌকা ইন্‌জিনে চলে। (চ) জাহাজ স্টীমারের চেয়ে আকারে অনেক ছোট।

পাড়া, গ্রাম, ইত্যাদি কাকে বলে ?

আমরা মানুষ; একসাথে থাকতে ভালবাসি। তাই আমরা এক এক পরিবারের লোক এক বাড়িতে বাস করি। এই রকম পাশাপাশি কতকগুলি বাড়ি মিলে **পাড়া** তৈরী হয়। যেমন—বামুনপাড়া, বোসপাড়া, ঘোষপাড়া।

পাশাপাশি কয়েকটা পাড়া নিয়ে একটা **গ্রাম** তৈরী হয়। গ্রামেরও একটা নাম থাকে। যেমন—মহেশগ্রাম, রামপুর, ইত্যাদি।

কয়েকটা গ্রাম নিয়ে একটা **ইউনিয়ন** তৈরী হয়। ইউনিয়নের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক নিয়ে গঠিত হয় **ইউনিয়ন বোর্ড** বা **ইউনিয়ন সমিতি**। সমিতির কাজ হল—ইউনিয়নে যাতে কোন গোলমাল না হয়, সেদিকে নজর রাখা এবং পথঘাট, পুকুর, নলকূপ ইত্যাদি মেরামত ও তৈরী করা।

কতকগুলি ইউনিয়ন নিয়ে একটি **থানা** গঠিত হয়। থানার অধীনে যে সব গ্রাম থাকে, সেখানে যাতে কোন গোলমাল না হয়, সেদিকে নজর রাখা থানার কাজ। থানার প্রধান সরকারী কর্মকর্তার নাম **দারোগা**। দারোগার অধীনে থাকে অনেক **পুলিস**। থানারও একটা নাম থাকে। তোমাদের থানার নাম কি ?

কয়েকটা থানা মিলে একটা মহকুমা হয়। তোমাদের মহকুমার নাম কি, বলতে পার ? মহকুমার প্রধান সরকারী কর্মকর্তাকে বলে **মহকুমা শাসক**। মহকুমা শাসকের অধীনে থাকেন কয়েকজন **উপ-শাসক**। এঁদের সাহায্যে মহকুমা শাসক মহকুমার সব রকম শাসন কাজ চালান।

মহকুমার যে প্রধান শহরে মহকুমা শাসক এবং উপ-শাসকেরা বাস করেন, তাহাকে বলে **মহকুমা সদর**।

একটা বা একটার বেশী মহকুমা মিলে জেলা হয়। জেলার শাসনকর্তার নাম **জেলা শাসক**। জেলার শাসন কাজের ভার

থাকে জেলা শাসকের উপর। জেলা শাসকের অধীনে আবার কয়েকজন **উপ-শাসক** থাকেন। মহকুমা শাসকও জেলা শাসকের অধীন।

জেলার যে-কোন একটা মহকুমার বড় শহরে জেলা শাসক থাকেন। এই শহরকে বলে **জেলার সদর**।

অনুশীলনী

১। পাড়া ও গ্রামে তফাত কি? তোমাদের গ্রামে কয়টা পাড়া আছে? থানার পুলিস কার অধীনে কাজ করে? মহকুমা কাকে বলে? মহকুমা শাসক যে শহরে থাকেন, তাকে কি বলে?

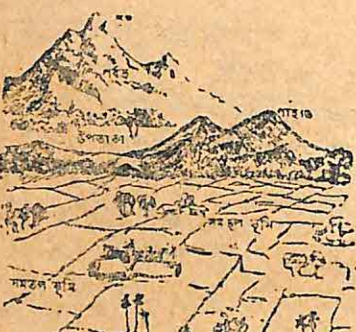
২। ভুল থাকলে সংশোধন কর :—(ক) কয়েকটা গ্রাম মিলে মহকুমা হয়। (খ) থানার প্রধান কর্মকর্তার নাম পুলিস। (গ) কয়েকটা থানা মিলে একটা ইউনিয়ন তৈরী হয়। (ঘ) যিনি মহকুমার শাসন কাজ চালান তাঁকে উপ-শাসক বলে।

নদী, হ্রদ, পাহাড় ইত্যাদির ধারণা

আমরা মাটি বা ভূমির উপর বাস করি। ভূমি সব জায়গায় একরকম নয়—কোন জায়গা সমান বা সমতল, কোন জায়গা উঁচু, কোন জায়গা নীচু।

সমতল ভূমি—যা উঁচু-নীচু নয়, তাই সমতল। যে ভূমি বেশী উঁচু-নীচু নয়, যার সব জায়গাই মোটামুটি সমান, তাকে সমতল ভূমি বলে। আমাদের এই বাংলা দেশের বেশীর ভাগ জায়গা সমতল।

পাহাড় ও পর্বত—তোমরা অনেকেই উঁচু মাটির ঢিবি দেখেছ। এই রকম আশেপাশের চারিদিককার জমি খুব উঁচু এবং বহুদূর ছড়ানো জায়গাকে পর্বত বলে। ছোট ছোট পর্বতকে বলে পাহাড়। পাহাড়-পর্বতের মাথার সবচেয়ে উঁচু জায়গাকে বলে **চূড়া** বা শৃঙ্গ। পাহাড়-পর্বত পাথর দিয়ে তৈরী। আমাদের এই বাংলা দেশের উত্তরে আছে হিমালয় পর্বত। পৃথিবীর মধ্যে হিমালয় পর্বত সবচেয়ে উঁচু ও বড়। এত উঁচু যে বারমাস তার মাথা সাদা বরফে ঢাকা থাকে। এই সব পাহাড়-পর্বতেও অনেক লোক বাস করে।



সমতল জমি ও পাহাড়-পর্বত

পুকুর ও দীঘি—পুকুর দেখেছ কি? চারদিকে মাটি দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে যে জল থাকে, তাকে বলে পুকুর। পুকুর মানুষে কাটে। দীঘি পুকুরেরই মত, তবে তার চেয়ে অনেক বড়।

হ্রদ—দীঘি বা পুকুরের মত হ্রদেরও চারদিক জমি দিয়ে ঘেরা থাকে, মাঝখানে বিরাট এলাকা জুড়ে থাকে জল। এই রকম জলভরা জায়গাকে বলে **হ্রদ**। পুকুর-দীঘির সাথে পার্থক্য হল —হ্রদ মানুষে কাটে না, আপনা থেকেই তৈরী হয়।

দ্বীপ—হ্রদের ঠিক বিপরীত হল দ্বীপ। সব দিক জল দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে জায়গাটুকু (ভূমি) থাকে, তাকে বলে **দ্বীপ**।

নদী—পাহাড়-পর্বত বা উঁচু কোন জায়গা থেকে জল নেমে আসে নীচের জমিতে। চলার পথে সেই জলের ধারা মাটিতে নালা কেটে এগোয়। নানা দেশ পার হয়ে এই জলধারা কোন সাগরে বা আর কোন জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। জলধারার এই নালার নাম **নদী**।

নদী আবার নানা রকম আছে। কোন কোন নদী পাহাড়-পর্বত থেকে বেরিয়ে সাগরে না পড়ে অন্য কোন নদীতে গিয়ে পড়ে। এই জাতীয় নদীকে বলে **উপনদী**।



কোন কোন নদী আবার পাহাড়-পর্বত থেকে না বেরিয়ে অন্য কোন নদী থেকে বেরোয়। এই নদীকে বলে শাখানদী।

খাল—দেশের ভিতরকার অনেক সরু সরু নালা দিয়ে জল এসে নদীতে পড়ে। এইসব নালাকে বলে **খাল**। খাল একটু বেশী চওড়া হলে, তাকে আমরা নদীও বলি। **খাল দুই রকমের** —কোন খাল আপনা থেকে তৈরী হয়, কোন খাল আবার মানুষে কাটে।

মোহনা—নদী যেখানে এসে সাগর বা অন্য কোন নদীতে মিশে, সে জায়গাকে বলে **মোহনা**।

সাগর—মনে কর, এমন এক জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে আছ, যার সামনে শুধুই জল। আর মাটি নেই, আছে কেবল জল আর জল। কূল নেই, কিনারা নেই—যেদিকে তাকাবে, দেখবে অথৈ জল আর বড় বড় ঢেউ। যেখানে এইরকম কূল-কিনারাহীন বহুদূর জায়গা জুড়ে বিরাট জলরাশি থাকে, তাকে বলে **সাগর** বা **সমুদ্র**।

অনুশীলনী

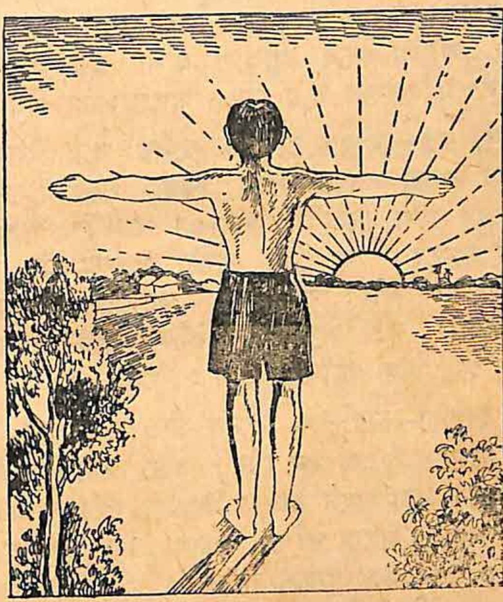
১। নদী ও খালে কি তফাত বল। হ্রদ আর দীঘিতে পার্থক্য কি? উপনদী ও শাখানদীতে কি পার্থক্য? পর্বত এবং চূড়া কাকে বলে?

২। ভুল থাকলে সংশোধন করঃ—(ক) দ্বীপের চারিদিকে থাকে মাটি বা ভূমি। (খ) সরু সরু নালাকে নদী বলে। (গ) সাগরের তীরে দাঁড়ালে সামনে হ্রদ দেখা যায়।

দিক ঠিক করা

গ্রামের কোন্ দিকে তোমাদের বাড়ি? তোমাদের বাড়ি থেকে পাঠশালা কোন্ দিকে? গাঁয়ের কোন্ দিকে মাঠ, বা বিল বা নদী? বলতে পার এসব? কোন্‌টা কোন্ দিক, না জানলে, কিছুতেই বলতে পারবে না।

দিক ঠিক করা—সূর্য যে দিকে ওঠে, তাকে বলে **পূর্বদিক**। পূর্বদিকে মুখ করে হাত দু'টো দু'পাশে সোজা টান করে



দাঁড়াও। তোমার পেছন দিককে বলে **পশ্চিম দিক**। সূর্য ডোবে পশ্চিম দিকে। যেদিকে তোমার বাঁ হাত, তাকে বলে **উত্তর দিক**, আর যেদিকে তোমার ডান হাত, তার নাম **দক্ষিণ দিক**।

এইবার উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বল তো কোন্‌টা কোন্ দিক?

রাত্রি ও দিনের বৈচিত্র্য

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে আকাশের রঙ

সূর্যোদয়—তোমরা বোধহয় খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠ। ভোরে উঠাই উচিত। খুব ভোরে উঠলে দেখবে রাতের গাঢ় আঁধার পাতলা হয়ে আসে। পৃথিবীর সব কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। কালো আকাশের ঝিকমিকে তারাগুলি ফিকে হয়ে আসে। কালো পূব আকাশ ধূসর হয় ধীরে ধীরে। পশু-পাখি জাগে, রাতের ঘুম ভেঙে জাগে সারা পৃথিবী।

আকাশের রঙ—দেখতে দেখতে ধূসর পূব আকাশ সাদা হয়। লালের আভা নজরে পড়ে কিছু পরে। সারা চরাচর জাগে, আঁধারের লেশ থাকে না কোথাও। মনে হয়, পূব আকাশে যেন আগুন ধরেছে। কে যেন মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে সেখানে। ধীরে ধীরে পূব আকাশে দিনমণি উদয় হয়—লাল থালার মত সূর্যমামা উঁকি মারেন। সকাল হয় তখন। মনে হয়, সারা পৃথিবী যেন হাসছে।

দিনের বৈচিত্র্য—চারদিকে দিনের কাজ শুরু হয়। মানুষ, পশু-পাখি, যে-যার কাজে মন দেয়। ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে থাকে। দুপুরে সূর্য ওঠে মাথার উপর। তারপর ধীরে ধীরে সূর্য আবার নামতে থাকে পশ্চিম দিকে। দিন শেষ হয়ে আসে, দিনের কাজও শেষ হয়ে আসে সবার।

সূর্য নামে পশ্চিম দিকে আরও নীচে। বিকাল হয় তখন। মানুষ, পশু-পাখি, সবার ঘরে ফেরা শুরু হয়।

সূর্যাস্ত—আকাশের রঙ—পশ্চিম আকাশে সূর্যমামা পাটে নামেন। সারা আকাশ লাল হয়ে ওঠে। পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর লাল রেখাগুলিকে তীরের মত মনে হয়। গাছের

সবুজ পাতায় পাতায় লাল আভা চিকচিক করতে থাকে। সবাই ঘরে ফেরে। সাদা বক আর কালো কাকের ঝাঁক সার বেঁধে আকাশ দিয়ে উড়ে চলে বাসার দিকে।

রাত্রির বৈচিত্র্য—দেখতে দেখতে রক্তরাঙা সূর্য অস্ত যায়। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় সেই লাল রঙ। সাঁঝের আঁধার নামে পৃথিবীর বুকে। গ্রামের ফাঁকে ফাঁকে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে, নমাজের সুর ভেসে আসে মসজিদ থেকে। বনে-জঙগলে শুরু হয় শিয়ালের একটানা ডাক। নিশাচর পশু-পাখি বেরোয় এবার শিকারের খোঁজে।

কালো আকাশে অসংখ্য তারকা দেখা দেয়, ঝিকমিক করে —মনে হয়, কে যেন অপরূপ একখানা চাঁদোয়া মেলে ধরেছে পৃথিবীর মাথার উপর।

চারদিক নিঝুম হয়ে আসে। সারাদিনের কাজের শেষে এবার সবাই বিশ্রাম নেয়—ঘুমোতে যায়। জেগে থাকে শুধু তারকার দল, নিশাচর পশু-পাখি, চোর-ডাকাত আর বাড়ির কুকুর-বিড়াল।

সূর্য, চন্দ্র এবং তারকা

সূর্য—আমাদের এই পৃথিবী খুব বড়—তাই না ? এত বড় যে, আমরা ঠিকমতো ধারণায় আনতে পারি না। কিন্তু সূর্য কত বড় জান ? **সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লাখ গুণ বড়;** অর্থাৎ তের লাখ পৃথিবী একত্র করলে একটা সূর্যের সমান হয়।

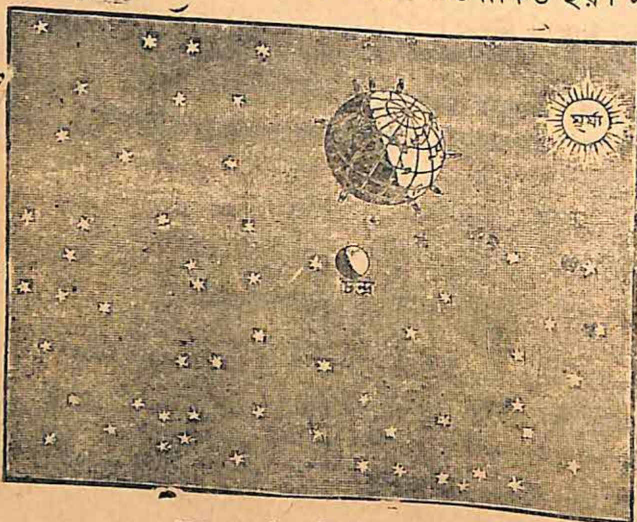
সূর্য পূর্ব দিকে উদয় হয়, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সূর্য উঠলে দিন হয়, অস্ত গেলে রাত্রি হয়।

সূর্য আছে বহু—বহু দূরে। তাই তাকে একটা ছোট থালার মত দেখায়। মনে কর, একটা গাড়িতে চড়ে আমরা

সূর্যের দিকে রওনা হলাম। খুব বেগে গাড়ি চলল—ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে। এইভাবে চললে সূর্যে পেঁাছাতে কত দিন লাগবে জান? দু'শ বছর।

সূর্যে রওনা হবার কথা কিন্তু ভেব না কখনও। কেউ তার কাছে কখনও যেতে পারে না। আমাদের এই মাটির পৃথিবীর মত সূর্য মোটেই ঠাণ্ডা নয়। **সূর্য একটা বিরাট জ্বলন্ত আগুনের গোলা—দাউ দাউ করে জ্বলছে সব সময়।** মানুষ তো দূরের কথা, এত বড় এই পৃথিবীটা যদি তার কাছে যায়, চোখের পলকে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

চন্দ্র বা চাঁদ—চাঁদ কিন্তু একেবারে ঠাণ্ডা। **চাঁদের নিজের কোন আলো নেই।** সূর্যের আলোয় সে আলোকিত হয়। **সূর্যের**



চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ও তারকা

আলো তার গায়ে পড়ে। সেই আলো আবার ছিটকে এসে পড়ে পৃথিবীর উপর। তাকেই আমরা বলি চাঁদের আলো—**জ্যোৎস্না।** রাত্রিবেলায় আঁধার পৃথিবী জ্যোৎস্নার আলোকে হেসে ওঠে।

চাঁদের আকার গোল। সূর্যের চেয়ে সে অনেক ছোট। **পৃথিবীর চেয়েও চাঁদ অনেক ছোট**—পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। **চাঁদই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আছে—মাত্র** দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে।

চাঁদ ওঠে রাতে। কোন কোন রাতে চাঁদকে দেখায় বড় গোল একখানা থালার মত! সে রাতকে বলে **পূর্ণিমা**। পূর্ণিমার পর থেকে চাঁদ ছোট হতে থাকে ধীরে ধীরে। এইভাবে চৌদ্দ রাত্রি ধরে সে ছোটই হয় কেবল। তারপর একদিন তাকে আর দেখা যায় না। চাঁদশূন্য সেই আঁধার রাত্রিকে বলে **অমাবস্যা**। অমাবস্যার পরের রাত্রি থেকে চাঁদ আবার আকাশে দেখা দেয়, ধীরে ধীরে সে বড় হতে থাকে, তারপর আবার ফিরে আসে পূর্ণিমা রাত্রি।

তারকা—রাত্রিবেলা আকাশে তারকার দল মিটমিট করে। মনে হয়, কে যেন ছোট ছোট হীরকের টুকরো লাখে লাখে আকাশময় ছড়িয়ে রেখেছে।

কিন্তু সত্যিই কি তারাগুলি এত ছোট? মোটেই নয়। **কোন কোনটা সূর্যের চেয়েও কোটি কোটি গুণ বড়**। তারা এত দূরে আছে যে সামান্য একটু আলো ছাড়া আর কিছুই তাদের দেখা যায় না।

ছায়াপথ—আঁধার রাতে পরিষ্কার মেঘশূন্য আকাশের দিকে ভালভাবে কোনদিন তাকিয়ে দেখেছ? দেখবে, আকাশের এক কিনারা থেকে আর এক কিনারা পর্যন্ত উজ্জ্বল সাদা একটা চওড়া পথের মত চলে গেছে। তার নাম ছায়াপথ বা হরিতালী। **অসংখ্য তারকা মিলে তৈরি করেছে এই ছায়াপথ।**

অনুশীলনী

১। দিক ঠিক করবার উপায় কি? দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ালে কোন্ হাত কোন্ দিকে যায়?

২। সূর্যোদয়ের বর্ণনা দাও। রাত্রি ও দিনের মধ্যে পার্থক্য কি? সকাল ও সন্ধ্যায় কি তফাত, বল। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আকাশের রঙ কেমন হয়?

৩। ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে চললে সূর্যে, পৌঁছাতে কত দিন লাগে? সূর্যের কাছে যাওয়া যায় না কেন?

৪। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী—কে কার চেয়ে বড়? ছায়াপথ কাকে বলে?

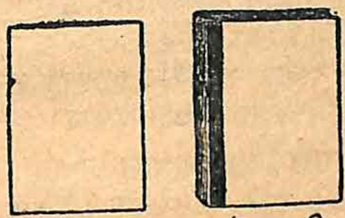
৫। ভুল থাকলে সংশোধন কর :—(ক) পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডান হাত যাবে পূব দিকে। (খ) ভোর বেলায় পশ্চিম আকাশে কে যেন লাল আবীর ছড়িয়ে দেয়। (গ) চাঁদ দাউ দাউ করে অবিরাম জ্বলছে। (ঘ) সূর্যের আলোকে বলে জ্যোৎস্না।

নক্‌শা-আঁকা

তোমরা ছবি আঁকতে পার? আঁকার চেষ্টা করে দেখ। দেখবে, কত কঠিন কাজ এই ছবি আঁকা। লেখাপড়ার মতো ছবি আঁকাও ভালভাবে শিখতে হয়। কিন্তু একটু চেষ্টা করলে তোমরা নক্‌শা আঁকতে পারবে। কিভাবে আঁকবে, শোন।

নক্‌শা—মনে কর, একখানা বইয়ের নক্‌শা আঁকতে হবে। এক খণ্ড কাগজের উপর বইখানা রেখে তার চার ধারে পেন্সিলের দাগ দাও। বইখানা সরিয়ে নিলে দেখবে, কাগজের উপর বই-খানার চারদিককার সীমানার দাগ পড়েছে। এই দাগই হল বইখানার নক্‌শা।

কাগজের উপর না রেখেও বইখানার নক্‌শা আঁকতে পার। বইখানা কত লম্বা কত চওড়া, তার মাপ নিয়ে কাগজের উপর



বইয়ের নক্‌সা বইয়ের ছবি

সেই মাপের চারিটি রেখা চারদিকে টান। তারপর সেই রেখাগুলি জুড়ে দিলেই বইয়ের নক্‌শা তৈরী হবে।

ছবি ও নক্‌শার তফাত—কোন্ জিনিস কোথায় রয়েছে এবং তার আয়তন কত, সেইটেই কেবল নক্‌শায় দেখান যায়। নক্‌শা দেখে জিনিসটা চেনা যায় না। ছবি দেখে জিনিস চেনা যায়। জিনিসটা কতখানি লম্বা ও চওড়া এবং দেখতে কেমন, তা ছবিতেই কেবল দেখান যায়। নকশা ও ছবিতে তফাত এইখানে।

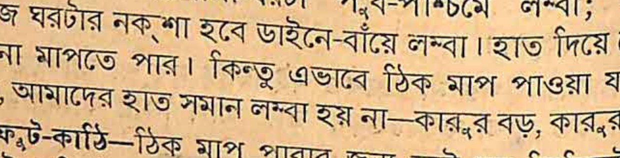
বড় জিনিসের নক্‌শা—এইবার মনে কর, তোমাদের পাঠশালা-ঘরের নক্‌শা আঁকতে হবে। কিন্তু এত বড় কাগজ পাবে কোথায় ? আর পেলেও তা ব্যবহার করা সোজা নয়।

বড় জিনিসের নক্‌শা ছোট করে আঁকবার সোজা নিয়ম আছে। প্রথমে মনে রাখবে, কোন নক্‌শা আঁকলে তার কোন্‌টা কোন্‌ দিক তা দেখাতে হয়। সাধারণত কাগজের উপরের দিক উত্তর, নীচের দিক দক্ষিণ, ডান দিকে পূব এবং বাঁ দিক পশ্চিম ধরা হয়। নক্‌শার কাগজের এক-এক দিকে উত্তরের বদলে উ. দক্ষিণের বদলে দ, পূবের বদলে পূ এবং পশ্চিমের বদলে প লিখে রাখবে।

তোমাদের পাঠশালা-ঘরটা পূব-পশ্চিমে লম্বা; কাজেই কাগজে ঘরটার নক্‌শা হবে ডাইনে-বাঁয়ে লম্বা। হাত দিয়ে তোমরা ঘরখানা মাপতে পার। কিন্তু এভাবে ঠিক মাপ পাওয়া যায় না। কারণ, আমাদের হাত সমান লম্বা হয় না—কারুর বড়, কারুর ছোট।

ফুট-কাঠি—ঠিক মাপ পাবার জন্য তাই সব জিনিসই ইঞ্চি, ফুট, ইত্যাদি দিয়ে মাপা হয়। ১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট। ১ ফুট লম্বা কাঠিকে **ফুট-কাঠি** বলে। ১২ ইঞ্চি বুঝবার জন্য এতে ১, ২, ৩, ইত্যাদি করে ১২টা বড় দাগ দেওয়া রয়েছে।

এইবার ফুট-কাঠি দিয়ে মাপলে দেখবে ঘরটা লম্বায় ২৪ ফুট। আর চওড়ায় ৮ ফুট। ৮ ফুটকে ½ ইঞ্চির সমান ধরে নাও।



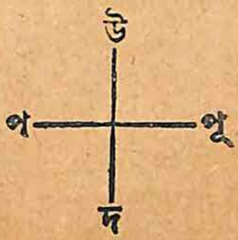
ফুট-কাঠির কিছু অংশ

তাহলে ২৪ ফুট হবে ১½ ইঞ্চির সমান এবং ৮ ফুট হবে ½ ইঞ্চির সমান। এখন কাগজের উপর ১½ ইঞ্চি লম্বা দুটো সোজা লাইন সামনাসামনি এবং ½ ইঞ্চি চওড়া দুটো সোজা লাইন সামনাসামনি

টেনে জুড়ে দাও। এইটাই হল ঘরখানার নক্‌শা। নীচে লিখে রাখ ৮ ফুট ½ ইঞ্চির সমান (৮ ফুট=½ ইঞ্চি)।



পাঠশালা-ঘরের নক্‌শা।
৮ ফুট ½ ইঞ্চির সমান।



এইভাবে তোমরা সামনের পথ সমেত গোটা পাঠশালা-বাড়ির নক্‌শাও আঁকতে পার। তাতে প্রত্যেকখানা পাঠশালা-ঘরের, উঠানের এবং সামনের পথের নক্‌শা থাকবে।

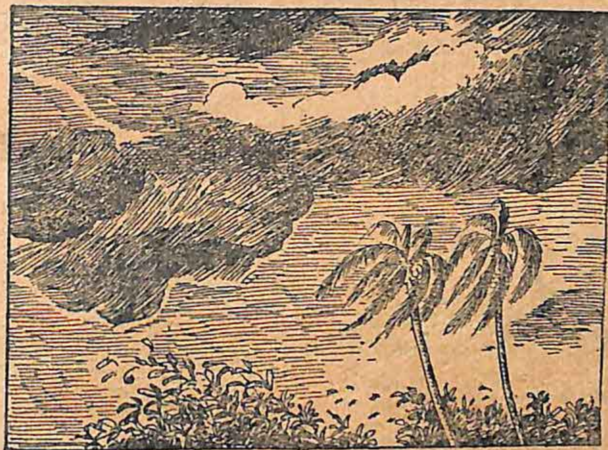
এইভাবে সব ছোট ছোট সোজা সোজা নক্‌শা আঁকতে আঁকতেই, একদিন তোমরা শিখবে বড় বড় বাড়ী-ঘর আর আমাদের বাংলাদেশের ছবি আঁকতে। আঁকবে তোমরা গোটা ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর ছবি।

।। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-অংশ ।।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের চেহারার পরিবর্তন

আমরা জানি, বার মাসে এক বছর। বাংলায় এই মাসগুলির **নাম**—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। তেমনি ছয় ঋতুতে এক বছর হয়, তাও আমরা জানি। দুই-দুই মাস নিয়ে এক-এক ঋতু। যেমন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—**গ্রীষ্ম** ঋতু, আষাঢ় ও শ্রাবণ—**বর্ষা**, ভাদ্র ও আশ্বিন—**শরৎ**, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ—**হেমন্ত**, পৌষ ও মাঘ—**শীত** এবং ফাল্গুন ও চৈত্র—**বসন্ত**। আমাদের এই বাংলাদেশের রূপের তুলনা নাই। বছরের এক এক ঋতুতে তার চেহারা হয় এক এক রকম, তার রূপ পালটায় বারে বারে।

গ্রীষ্ম—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে খুব গরম পড়ে। ঝাঁ-ঝাঁ রোদে সব যেন ঝল্‌সাতে থাকে। এই সময় পাকে রসাল ফল। কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড় ওঠে। আম কুড়োবার ধূম পড়ে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে কৃষক জমি চাষ করে, উপরের জমিতে বোনে পাট, আউশ ধান আর ভুট্টা। মটর কলাই তখন পাকে।



কালবৈশাখী

বর্ষা—গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা আসে। আষাঢ়-শ্রাবণে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। নানা ফুল ফোটে। টোকামাথায় দলে দলে কৃষক নামে মাঠে। নীচু জমিতে তারা আমন ধান বোনে, উপরের জমিতে বোনে তিল। শ্রাবণ-ভাদ্রে তারা পাট কাটে, ঘরে তোলে আউশ ধান আর ভুট্টা। চারা আমন আর তিলের ক্ষেত তারা পরিষ্কার করে।

শরৎ—বর্ষার পর শরৎ আসে। সাদা মেঘখণ্ড ভেসে চলে আকাশপথে। সাদা কাশফুলে খাল, বিল ও নদীর ধার ছেয়ে যায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে অজস্র—শিউলি, জুঁই, টগর, অপরাজিতা, কদম্ব, জবা, গন্ধরাজ। থোকা থোকা ধান হয় সবুজ শীষে। মাঠে উপরের জমিতে কৃষক ছোলা আর মুগ বোনে;

বোনে আলু, মুলো, কপি, বেগুন, টোমাটো, লাউ, কুমড়ো, পালং, শসা, শিম, নানা রকম শাক-সবজি।



শরৎকাল

হেমন্ত ও শীত—শরৎ যায়, হেমন্ত আসে, আসে শীত। ভোরের কুয়াশা ভেদ করে সূর্য ওঠে। উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপতে থাকে। শিমুল, অশ্বত্থ, জিওল, নিম, মাদার ও আমড়া গাছ থেকে ঝরে পড়ে সব পাতা, ন্যাড়া ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। অঘ্রান-পোষ মাসে সোনালী পাকা ধানে মাঠ ভরে যায়। কী সে রং! ধান কাটতে চাষীরা মাঠে নামে।

নবান্নের ধুম পড়ে বাড়ি বাড়ি। ক্ষেত ভরে যায় নানা শাক-সবজি—আলু, কপি, বেগুন, মুলো, পালং, বরবটি, টোমাটো, লাউ, কুমড়োতে। মটর, কলাই আর সরষে ক্ষেত নজরে পড়ে। হলদে ফুলে ছেয়ে যায় সরষে ক্ষেত।

বসন্ত—শীতের পর বসন্ত আসে। গাছে গাছে দেখা দেয় নতুন পাতা, নতুন কুঁড়ি। ফুল ফোটে অজস্র; ফোটে মালতী,



বসন্তকাল

চাঁপা, করবী, মাধবী, অপরাজিতা, গাঁদা, জবা, অশোক, কুন্দ, টক্‌টকে লাল ফুলে ছেয়ে যায় পলাশ আর শিমুল গাছ। আম, জাম, লিচু প্রভৃতি গাছে বোল ধরে, কাঁঠাল গাছে মুচি পড়ে। ফুলে ফুলে ওড়ে প্রজাপতি, ভোমরা, মৌমাছি। পাখিরা সব গানের ঝঙ্কার তোলে গাছে গাছে। বাংলাদেশে বসন্ত আসে।

গাছপালার জীবন-কথা

সবুজ শ্যামল আমাদের এই বাংলাদেশ। গাছপালায় ছাওয়া মনোহর দেশ। আমাদের চারপাশে কত গাছপালা, লতাপাতা, ঝোপঝাড়, কত বনজঙ্গল। তাদের ফুল, ফল আর সবুজ পাতা আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের খাদ্য যোগায় তারা।

আমাদের মত গাছপালারও জীবন আছে। আমাদের মত তাদের শরীরেও নানা অংশ আছে, যেমন—**শিকড়, গুঁড়ি, পাতা, ফুল, ফল,** ইত্যাদি।

একটা তেঁতুলের চারা উঠিয়ে আন। দেখবে, তার এক অংশ আছে মাটির নীচে, বাকিটা মাটির উপরে। গাছের যে অংশ মাটির নীচে থাকে, তাকে বলে **শিকড়**। মাটির উপরকার অংশকে বলে **গুঁড়ি** বা **ডাঁটা**। গুঁড়ি এবং ডালপালার গায়ে সাজান থাকে **পাতা** ও **ফুল**। ফুল থেকে হয় **ফল**।



তেঁতুলের চারা

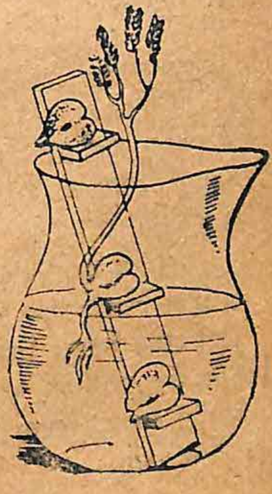
গাছপালার জন্ম—কিন্তু গাছপালা জন্মায় কিভাবে? তোমাদের পাঠশালার পাশে কোন ফাঁকা জমি আছে কি? থাকলে, সেখানে তোমরা ফুল-ফলের বাগান করতে পার। তাহলে তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে, কিভাবে গাছপালার জন্ম হয়, কিভাবে তারা বাড়ে, কিভাবেই বা তাদের পাতা গজায়, ফুল ফোটে, ফল হয়।

প্রথমে জমি ভালভাবে কোপাবে। মাটি হবে একেবারে ঝুর-ঝুরে। তারপর একদিন গাছের কয়েকটা বীজ পুঁতবে সেই

মাটিতে। জল দেবে মাঝে মাঝে। কয়েকদিন পরে দেখবে, মাটি ফুঁড়ে ছোট ছোট ডাঁটা বেরিয়েছে, তার মাথায় সবুজ পাতা। একটা চারা তুললে দেখবে, বীজের এক দিক থেকে ডাঁটা বা গুঁড়ি বেরিয়ে মাটির উপর উঠেছে, অন্য দিক থেকে শিকড় বেরিয়ে মাটির নীচে গেছে। তাহলে দেখ, **বীজ থেকে চারাগাছ হয়।** কিন্তু সব সময়েই কি বীজ থেকে চারা গজায় ? না।

চারা গজাবার জন্য বীজের তিনটি জিনিস ঠিক মত দরকার —**জল, বাতাস ও আলো।** এদের কোন একটার অভাব কিংবা কম-বেশী হলে সাধারণতঃ চারা গজায় না।

জল না হলে গাছপালা ত দূরের কথা, জীবজন্তু, পশুপাখি, কোন কিছু বাঁচে না। সেইরকম, বাতাসে গাছপালার খাবার থাকে, সুতরাং বাতাস তাদের একান্তই দরকার। তাপ বা আলোর অভাবেও গাছপালা মরে যায় দু-চার দিনের মধ্যেই। তোমরা নিজেরাও এসব পরীক্ষা করে দেখতে পার।



পরীক্ষা—একটা কাঁচের পাত্রে খানিকটা জল নাও। লম্বা এক ফালি কাঠকে পাত্রের মধ্যে হেলান দিয়ে রাখ। কাঠের খানিকটা অংশ জলের মধ্যে থাকবে। বাকী অংশ থাকবে জলের উপর। এইবার কাঠের গোড়ায়, মাঝখানে ও উপরে তিনটা ছোলার বীজ এঁটে দাও। গোড়ার বীজটা থাকবে জলের মধ্যে, মাঝখানের বীজটার কিছুটা থাকবে জলের মধ্যে আর কিছুটা জলের বাইরে বা উপরে এবং উপরকার বীজটা থাকবে একেবারেই জলের বাইরে।

দু-একদিন পরে দেখবে, কেবল মাঝখানের বীজটারই চারা

গজিয়েছে। বল তো, অন্য বীজ দুটোর চারা গজাল না কেন ? তার কারণ, কাঠের গোড়ার দিককার বীজটা কেবল জল পেয়েছে, আলো ও বাতাস পায়নি। উপর দিককার বীজটা আলো ও বাতাস পেয়েছে বটে, কিন্তু জল পায় নি। আর মাঝখানের বীজটা আলো, বাতাস ও জল সমানভাবে পেয়েছে বলে চারা বেরিয়েছে।

শিকড়—আমরা দেখেছি, চারাগাছের শিকড় বেরিয়ে মাটির ভিতর যায়। গাছপালার শিকড় থাকে মাটির নীচে। লক্ষ্য করলে দেখবে, কোন গাছের একটা শিকড় বেরোয়, কোন গাছের শিকড় বেরোয় এক গোছা। শিকড় আছে নানা রকমের।



মূল শিকড়



গোছা শিকড়

ছোলা এবং ধানের দুটো চারা তুলে আন। দেখ, ছোলার চারার শিকড় একটা, ক্রমে সরু হয়ে সেটা মাটির ভিতর চলে গেছে। এইটেকেই বলে **প্রধান** বা **মূল শিকড়**। প্রধান শিকড়ের গা থেকে সরু সরু অনেক শিকড় বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, বট প্রভৃতি গাছেরও প্রধান বা মূল শিকড় হয়।

এইবার ধান-চারার শিকড় লক্ষ্য কর। দেখ, তার কোন প্রধান বা মূল শিকড় নেই, আছে ছোট একগোছা শিকড়। অনেকগুলো ছোট ছোট শিকড় মিলে **গোছা শিকড়** হয়। ধান গাছের মত গম, ভুট্টা, যব, পেঁয়াজ, আখ, বাঁশ, নারিকেল, সুপারি, খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের গোছা শিকড় হয়, তারা মাটির ভিতর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গুঁড়ি ও ডাঁটা—মাটির উপরে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে। তার মাথায় ডালপালা গজায়। মাটির উপর থেকে ডালপালার নীচে

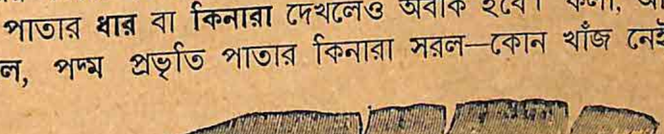
পর্যন্ত গাছের এই অংশকে **গঁড়ি** বা **কাণ্ড** বলা হয়। নানা গাছের গঁড়ি নানা রকম। আম, জাম, তাল, নারিকেল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি বড় বড় গাছের গঁড়ি মোটা ও লম্বা হয়। তারা বেশীর ভাগ হয় গোল ও শক্ত এবং মাটির উপর সোজা খাড়া থাকে।

লতানে গাছের কাণ্ডকে বলে **ডাঁটা**। ডাঁটা হয় নরম, সরু ও দুর্বল। লাউ, কুমড়ো, শসা, ঘাস, শিম প্রভৃতি লতানে গাছের ডাঁটা তাই সোজাভাবে খাড়া থাকতে পারে না, লতিয়ে চলে।

পাতা—গাছের পাতা দেখবে হরেক রকম। **নানা গাছের নানা রকম পাতা**—কোনটা লম্বা, কোনটা গোল; কোনটা ছোট, কোনটা বড়।

পাতা দেখে গাছ চেনা যায়। নানা পাতার **আকার** নানা রকম। কুল ও পদ্মের পাতা গোল। টগর ও মাধবী গাছের পাতা ডিমের মত। বাঁশের পাতা বল্লমের মত। ধান, কাশ, যব, ভুট্টা, উলুখড় প্রভৃতির পাতা সরু তলোয়ারের মত। কচুর পাতা তীরের ফলার মত।

পাতার **ধার** বা **কিনারা** দেখলেও অবাক হবে। কলা, আম, কাঁঠাল, পদ্ম প্রভৃতি পাতার কিনারা সরল—কোন খাঁজ নেই।



কলার পাতা

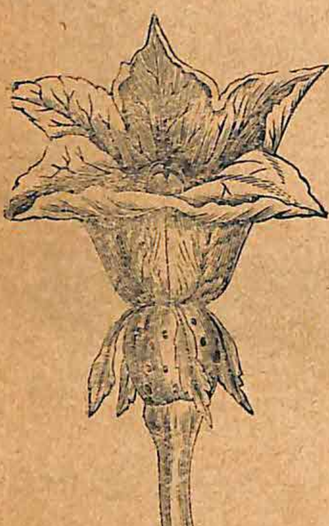
কিন্তু জবা, গোলাপ প্রভৃতি পাতার কিনারায় খাঁজ আছে। পেঁপে, তাল, তরমুজ প্রভৃতি পাতার ধারের খাঁজ আরও বড়। দেবদারু পাতার ধার ঢেউ-খেলান। আনারস পাতার ধারে আর খেজুর পাতার আগায় দেখবে কাঁটা।

পাতার বোঁটার দিকে নজর দাও। দেখবে, আম, কাঁঠাল, কলা,

প্রভৃতি পাতার বোঁটা থাকে তার গোড়ার দিকে। কিন্তু পদ্ম-পাতার বোঁটা আছে পাতার মাঝখানে।

সব পাতা আবার সমান পুরু নয়। আম, বাঁশ প্রভৃতির পাতা পাতলা। কিন্তু পুঁই, পালং, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতির পাতা বেশ পুরু।

ফুল—ফুল সবাই ভালবাসে। গাছে গাছে রঙ-বেরঙের নানা বাহারের কত রকম ফুল ফোটে। কোন ফুলের গন্ধ আছে। কোন ফুলের গন্ধ নেই। লক্ষ্য করলে দেখবে, **এক এক রকম ফুলের গড়ন এক এক রকম**। কোন ফুলে পাঁচটি পাঁপড়ি, কোন ফুলে দশটি, কোন ফুলে আবার একটি। রক্তজবা, শ্বেতজবা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি ফুলের অনেকগুলি পাঁপড়ি থাকে।



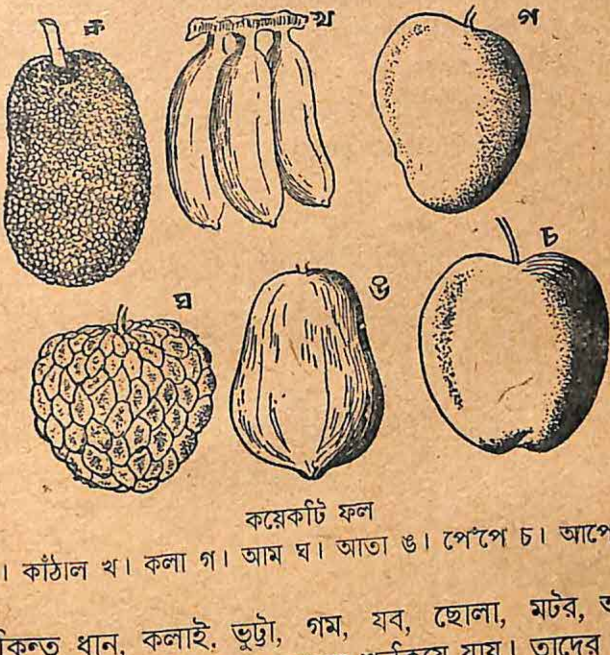
কুমড়ো ফুল

লাউ, কুমড়ো, আকন্দ, ধুতুরা প্রভৃতি ফুলের বাইরে বেড় বা ঠোঙা থাকে একটা—সব একসঙ্গে জোড়া। তাদের পাঁপড়িগুলিও একসঙ্গে জোড়া থাকে এবং দেখতে হয় ঠিক চোঙের মত। কিন্তু গোলাপ, সরষে, মুলা প্রভৃতি ফুলের বাইরের বেড়টা একসঙ্গে জোড়া নয়—আলাদা আলাদা। পাঁপড়িও তাদের আলাদা, প্রত্যেক পাঁপড়ির বোঁটাও দেখবে আলাদা।

সূর্যমুখী, গাঁদা, কদম প্রভৃতি ফুলকে দেখায় একটা গোটা ফুলের মত। আসলে কিন্তু তা নয়; অনেকগুলি ফুল মিলে তৈরী হয় এক একটা ফুল।

ফল—ফুল থেকে ফল হয়। রকমারি ফল খাই আমরা—কোনটা মিঠা, কোনটা টক, কোনটা আবার তেতো।

ফল দেখবে দু-রকমের—**রসাল ও শুকনো।** আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, আনারস, পেয়ারা, পেঁপে, কলা, লেবু, বেগুন প্রভৃতি রসাল ফল। কারণ এদের ভিতরটা সব সময়ই রসাল থাকে।



কয়েকটি ফল

ক। কাঁঠাল খ। কলা গ। আম ঘ। আতা ঙ। পেঁপে চ। আপেল

কিন্তু ধান, কলাই, ভুট্টা, গম, যব, ছোলা, মটর, আকন্দ প্রভৃতি ফল পাকলেই তাদের খোসা শুকিয়ে যায়। তাদের খোসা হয় সাধারণতঃ পাতলা ও নীরস। তাই তাদের বলে শুকনো ফল।

অনুশীলনী

১। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তোমাদের গ্রামের চেহারা কি রকম পরিবর্তন হয়, তার ছোট একটা বিবরণ দাও।

২। কোন্ ঋতু তোমাদের ভাল লাগে? শীত ও বসন্ত ঋতুর একটা বর্ণনা দাও।

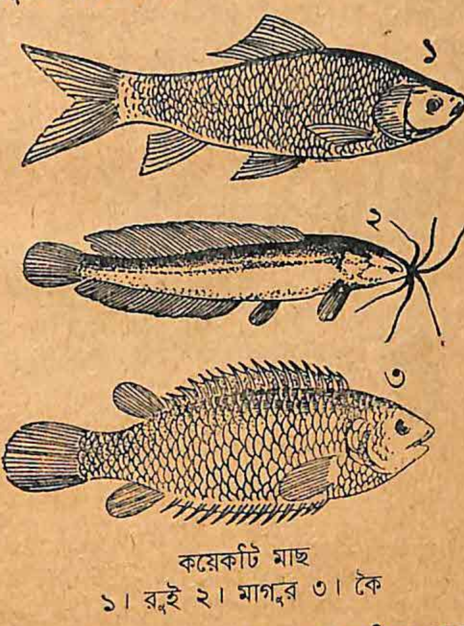
৩। গাছপালার শরীরে মোটামুটি কতকগুলি অংশ আছে? চারা গজাবার জন্য বীজের কি কি জিনিস দরকার?

৪। প্রধান শিকড় ও গোছা শিকড়ে পার্থক্য কি? গুঁড়ি ও ডাঁটার পার্থক্য বল। বাঁশপাতা ও কচুর পাতায় এবং পদ্মপাতা ও পেঁপের পাতায় কি পার্থক্য, বল। সূর্যমুখী ও গোলাপ ফুল কি একজাতীয়? লাউ ফুল ও সরষে ফুলে তফাত কি? ফল সাধারণতঃ কয় রকম?

মাছ, ব্যাঙাচি ও শামুক

মাছ—বাঙালী আমরা মাছ খাই। মাছ জলে বাস করে। **জল** ছাড়া সে বেশী সময় বাঁচে না। বাতাস না হলে কোন জীব **বাঁচে** না। সব জীবেরই শ্বাস নিতে হয়। যেসব জীব ডাঙায় **বাস** করে, তাদের শ্বাস নেওয়ার অনেক সুবিধা। কিন্তু মাছ **থাকে** জলে। সে নিশ্বাস নেয় কিভাবে ? **মাছ নিশ্বাস নেয় কান্‌কো দিয়ে**। জলে বাতাস মিশান থাকে। জল থেকে কান্‌কোর সাহায্যে মাছ সেই বাতাস টেনে নেয়।

মাছ জলে ডিম পাড়ে। মাছের ডিম তোমরা সবাই খেয়েছ। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। মাছের বাচ্চাকে বলে **পোনা।**



কয়েকটি মাছ
১। রুই ২। মাগুর ৩। কৈ

নানারকম মাছ আছে। কোন মাছ নদীতে বাস করে, কোন মাছ বাস করে বিলে। রুই, কাতলা, ইলিশ প্রভৃতি মাছের গায়ে **আঁশ থাকে।** মাগুর, শিঙি প্রভৃতি মাছের গায়ে **আঁশ থাকে না।**

জলে সাঁতরাবার জন্য **মাছের ডানা** আছে। রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছের ছ’খানি ডানা থাকে। কই মাছের ডানা আরও বেশী—তার পিঠে আগাগোড়াই প্রায় ডানা।

ব্যাঙাচি—ব্যাঙ আমরা হামেশা দেখি। ব্যাঙ জলে এবং ডাঙায়, দু’ জায়গাতেই থাকে। ভারী অদ্ভুত তাদের জীবন।

মাছের মত ব্যাঙেরও ডিম হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। ব্যাঙের বাচ্চাকে বলে **ব্যাঙাচি**। ব্যাঙাচি দেখতে প্রায় মাছের মত। তার গোটা শরীরটায় থাকে কেবল গোল একটা মাথা আর লম্বা একটা লেজ।

অদ্ভুত পরিবর্তন—জন্মের কয়েকদিন পরে ব্যাঙাচির মুখ বেরায়। দিনরাত সে যা পায়, তাই গিলতে থাকে। মাছের মত



১ নং হইতে ৭ নং—ব্যাঙাচির বিভিন্ন অবস্থা।
৮ নং হইতে ৯নং—ব্যাঙে রূপান্তর।

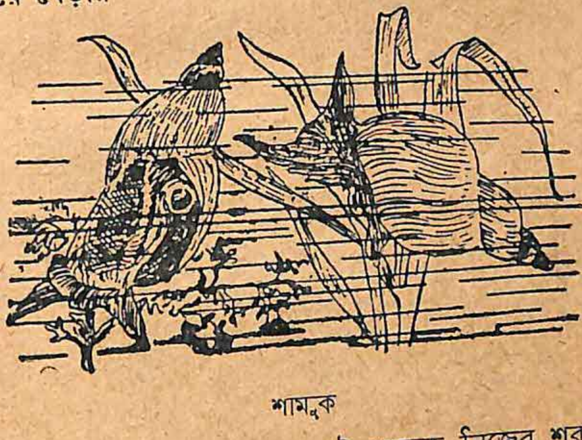
ব্যাঙাচিরও প্রথমে কান্‌কো হয়, কান্‌কো দিয়ে সে নিশ্বাস নেয়। কয়েকদিন পরে তার পিছনের পা দু’খানা বেরোয়; চেহারা ক্রমেই ব্যাঙের মত হতে থাকে। যত সে বড় হতে থাকে, তার লেজও তত ছোট হতে হতে শেষে একদিন মিলিয়ে যায়। হঠাৎ একদিন চামড়া ফেটে তার সামনের পা দু’খানা বেরোয়—**ব্যাঙাচি হয় আসল ব্যাঙ**। ব্যাঙডাঙায় উঠে আসে।

শামুক—আলসে লোককে আমরা বলি শামুকের মতো কুড়ে। আসলে শামুক কিন্তু কুড়ে না। সে খুব ধীরে ধীরে চলে, তাই তাকে আমরা কুড়ে ভাবি।

শামুক তোমরা সবাই দেখেছ। **শামুকের জন্মও ডিম থেকে।** শামুকের হাত, পা, ডানা, কিছুই নেই। তার শরীরে হাড় নেই, আছে শুধু গায়ের উপর মজবুত একটা খোলা।

শামুক জলের ধারে সাদা সাদা ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে বাচ্চা হয়। বাচ্চা শামুকের দেহ যেমন বাড়ে, খোলাও বাড়ে তেমনি।

শামুক দু' জাতের—জলের শামুক আর ডাঙার শামুক। জলের শামুকের খোলা দেখতে কিছুটা গোল, ডাঙার শামুকের খোলা সূঁচলো। খোলাটাই বাসা বা বাড়ি। বাড়ি পিঠে নিয়েই সে ঘুরে বেড়ায়।



শামুক

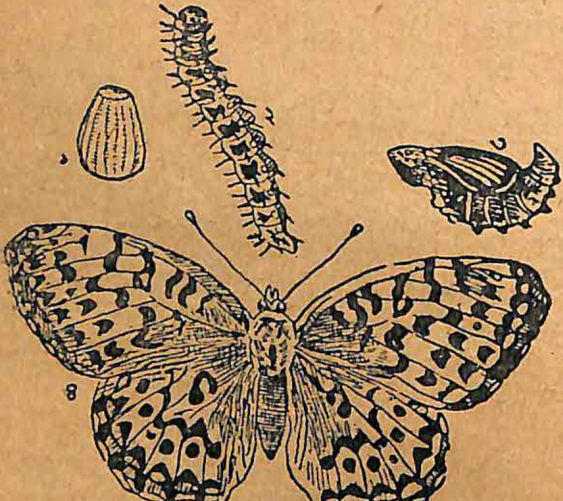
চলার সময় কোন বাধা পেলেই শামুক নিজের শরীরটাকে খোলার মধ্যে টেনে নেয়, ভিতরে গিয়ে লুকোয়। শামুকের মুখ থাকে মাথার নীচে। তার দাঁত ভারী নরম। তাই শীঘ্রই সেগুলো ক্ষয়ে যায়। কিন্তু শামুক তাতে বুড়ো হয় না। মুখে নতুন দাঁত এসে হাজির হয় আবার।

শুঁয়োপোকার কথা

ফুলে ফুলে রঙ-বেরঙের প্রজাপতি ঘুরে বেড়ায়, ফুলের মধু খায়। অপরূপ সুন্দর তাদের চেহারা। তেমনি বড় অদ্ভুত তাদের জন্মের ইতিহাস।

তোমরা বাড়িতে, বাগানে, গাছের ডালে নিশ্চয়ই নানা রকম শুঁয়োপোকা দেখেছ। বিশ্রী তাদের চেহারা। বলতে পার, কোথা থেকে আসে এসব শুঁয়োপোকা ?

রঙিন চারখানা ডানা মেলে সুন্দর যেসব প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, **বেশীর ভাগ শুঁয়োপোকাই সেই সব প্রজাপতির বাচ্চা।** অবাক কাণ্ড! তাই না?



১। ডিম ২। শুঁয়োপোকা ৩। পুত্তলি ৪। প্রজাপতি

শুঁয়োপোকার জন্ম—গাছের পাতায় বা সরু ডালে **প্রজাপতি** সরষের মত বহু ছোট **ডিম** পাড়ে। ডিম পেড়েই সে মারা যায়।

কয়েক দিন পরে ডিম ফ‍ুটে বেরোয় **শ‍ুঁয়োপোকা**। জন্মেই সে ডিমের খোসাটা খেয়ে ফেলে। এই সময় তার বেজায় ক্ষিদে পায়, দিনরাত কেবল গাছের পাতা গিলতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যে সে বেশ মোটাসোটা হয়ে পড়ে।

পরিবর্তন—তারপর হঠাৎ একদিন তার খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়। ম‍ুখের লালা দিয়ে সে নিজের চারিদিকে একটা খোলস বা গ‍ুটি তৈরি করে। সেই গ‍ুটির মধ্যে সে পড়ে থাকে মড়ার মত। তখন তাকে বলে **প‍ুত্তলি**। এই সময় নানা রকম সব অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার দেহের মধ্যে। তারপর একদিন গ‍ুটি কেটে বের হয় ডানাওয়ালা স‍ুন্দর **প্রজাপতি**।

অন‍ুশীলনী

১। ব্যাঙের জীবন অদ্ভুত কেন? ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হয় কিভাবে?

২। কি থেকে মাছের জন্ম হয়? মাছের বাচ্চাকে কি বলে? জলের মধ্যে মাছ কিভাবে বাঁচে এবং সাঁতার কাটে? কয় রকম মাছ দেখেছ?

৩। শাম‍ুকের শরীরে বিশেষ কি লক্ষণীয় জিনিস আছে? শাম‍ুক ব‍ুড়ো হয় না কেন? ভয় পেলে শাম‍ুক কি করে?

৪। প্রজাপতির জন্ম-বিবরণ দাও। শ‍ুঁয়োপোকা কি ভাবে হয়?

৫। ভুল থাকলে সংশোধন কর—(ক) প‍ুত্তলি জন্মেই খোসাটা খেয়ে ফেলে। (খ) মাছ নাক দিয়ে নিশ্বাস নেয়। (গ) ব্যাঙাচির গায়ে আঁশ থাকে। (ঘ) শাম‍ুকের শরীরের হাড় বেশ মজব‍ুত। (ঙ) মাগ‍ুর মাছের আঁশ বেশ বড়।

গৃহপালিত পশুর কথা

বাড়িতে আমরা বিড়াল, কুকুর, গরু, এই রকম আরও নানা পশু পুষে থাকি। তাই এই সব পশুদের বলে গৃহপালিত পশু। নানাভাবে তারা আমাদের উপকার করে।

বিড়াল—পোষা জন্তুদের মধ্যে বিড়াল সবচেয়ে আয়েশী ও আদুরে। রাত্রিতে কোলের কাছটিতে সে শুয়ে থাকবে। শীতকালে লেপের নীচে না শুলে তার আরামই হয় না। বাঘের সঙ্গে বিড়ালের চেহারার খুব মিল দেখতে পাবে। তাই বিড়ালকে বলে বাঘের মাসী। বিড়াল ওস্তাদ শিকারী। ইঁদুরের উৎপাত থেকে এরা আমাদের বাঁচায়।



বিড়ালের মুখে গোঁফ আছে। তার সারা গা পশমের মত নরম লোমে ঢাকা। লম্বা লেজটা বড় বড় ঘন লোমে ভরা। প্রত্যেক পায়ের নীচেকার থাবা নরম মাংসের ঢিপি দিয়ে তৈরী; তাই হাঁটার সময়ে পায়ের কোন শব্দ হয় না। থাবার মধ্যে লুকান থাকে ধারাল নখ; বিড়াল রেগে গেলে নখগুলি সব বেরিয়ে আসে।

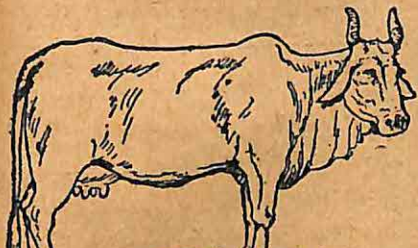
রাত্রিবেলায় বিড়াল ভাল দেখতে পায়। অন্ধকারে তার চোখের মণি জ্বলতে থাকে। দুধ ও মাছ খেতে সে সবচেয়ে ভালবাসে। তার প্রধান দোষ, সুযোগ পেলেই সে মাছ, দুধ চুরি করতে কসুর করে না।

কুকুর—বিড়ালের চেয়ে কুকুর আরও বেশী উপকারী। তার মত বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত জীব আর দুটি মেলে না। বুদ্ধিও তার খুব। সে দিনরাত আমাদের বাড়ি পাহারা দেয়। রাত্রিতে তার ভয়ে চোর, শিয়াল প্রভৃতি বাড়ির কাছেও ঘেঁষতে পারে না। মনিবের জন্য সে জীবন পর্যন্ত দেয়।



কুকুরের মুখ সরু, চোয়াল লম্বা, সারা গা লোমে ঢাকা। লেজ বেশ লম্বা। সে মাছ, ভাত, মাংস ইত্যাদি খায়।

গরু—সব রকম খাদ্যের মধ্যে দুধই সবচেয়ে বেশী বলকারী। গরুই সে দুধ দেয়। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গরুই আমাদের সবচেয়ে বেশী উপকার করে। পাড়াগাঁয়ে প্রায় সব বাড়িতেই গরু পোষা হয়।



ক্ষীর, দই, ঘোল, ঘি, মাখন, ছানা, সন্দেশ প্রভৃতি নানা রকম চমৎকার সব খাবার তৈরী হয় গরুর দুধ থেকে। গরুর গোবর ও চোনায় ভাল সার হয়। গরু লাঙল ও গাড়ি টানে। তার চামড়া, হাড়, ক্ষুর, শিং ইত্যাদি থেকে তৈরী হয় দরকারী সব নানা রকম জিনিস।

পুরুষ গরুকে **ষাঁড়** বা **বলদ** বলে, আর স্ত্রী গরুকে বলে **গাভী** বা **গাই**। গরু খুব শান্ত ও নিরীহ। তার মাথায় দুটো

শিং। তার সারা গা লোমে ঢাকা। প্রত্যেক পায়ের ক্ষুর মাঝখানে চেরা। গরুর লেজ লম্বা, লেজের আগায় থাকে একগোছা চুল। তার বাঁট চারটে। গরুর বাচ্চাকে বলে **বাছুর।**

গরু জাবর কাটে। কি ভাবে ? খাবার প্রথমে না চিবিয়ে সে গিলে ফেলে। তারপর সুবিধামত সময়ে সেই খাবার উগ্‌রে আবার মুখে নিয়ে আসে এবং আরাম করে চোখ বুজে চিবোতে থাকে। একেই বলে জাবর-কাটা।

আরও কয়েকটি পশুর কথা

॥ গৃহপালিত ও বন্য পশু ॥

পাড়াগাঁয়ে ঝোপে-ঝাড়ে, বনে-জঙ্গলে নানা রকম বুনো জানোয়ার বাস করে। শিয়াল তো হামেশাই দেখা যায়। সজারুও নজরে পড়ে মাঝে মাঝে।



শিয়াল—কথায় বলে, 'সব শিয়ালের এক রা'। ভারী মজা ঘটে, যদি একটা শিয়াল 'হুক্কা-হুয়া' ডেকে ওঠে। তাহলে আশে-পাশে যতগুলো শিয়াল থাকবে, সবাই ডেকে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে।

শিয়াল দেখতে প্রায় কুকুরের মতো। কিন্তু কুকুর তার ঘোরতর শত্রু। দিনের বেলায় শিয়াল খুব বেশী দেখা যায় না। সে নিশাচর —রাতেই বেরোয় শিকারের খোঁজে। শিয়াল ভারী চালাক। মাংস খেতে সে ভালবাসে। সুযোগ পেলেই তাই হাঁস, মুরগী, ছাগল, ইত্যাদি নিয়ে সে

চম্পট দেয়। গাছের কাঁঠাল, ক্ষেতের আখ ইত্যাদির উপরও তার লোভ খুব।

লম্বায় আর উঁচুতে সে প্রায় কুকুরের মত। মুখটা তার সূঁচালো। মেটে মেটে লোমে সারা গা ঢাকা। লম্বা লেজটা ফোলান আর বড় বড় লোমে ঢাকা।

সজারু—খেজুরের কাঁটা, বেলের কাঁটা, বাব্‌লার কাঁটা—কত রকম কাঁটাই তো তোমরা দেখে থাক। কিন্তু এমন একটা পশুর নাম করতে পার যার সারা গা কাঁটায় ভর্তি? তার নাম সজারু।

সজারুর সারা গা বড় বড় সূঁচের মতো কাঁটায় ভরা। কাঁটার ভয়ে কেউ তাই সহজে তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। সজারুর দাঁত ভারী ধারাল। তারা ফলমূল, গাছের ছাল, ইত্যাদি খায়; ওল ও কচু খেতে তারা সবচেয়ে ভালবাসে। সজারুও নিশাচর। রাতে খাবারের খোঁজে সে বের হয়।

হাতী—সবচেয়ে বিরাট জানোয়ার হলো হাতী। হাতী সাত-হাট হাত পর্যন্ত উঁচু হয়। এক একটির ওজন একশ'



থেকে দেড়শ' মণ। বুঝতেই পারছ কি বিশাল দেহ। হাতীর পাগুলি তো পা নয়, যেন দালানের একটা থাম! কান দুটোও তার অদ্ভুত—ঠিক যেন কুলোর মতো। পুরুষ হাতীর শুঁড়ের

পাশ দিয়ে দুটো লম্বা সাদা দাঁত বেরোয়—ঠিক যেন দুটো শিং। এক একটা দাঁতের ওজন হয় প্রায় দেড় মণ, দু'মণ। হাতীর দাঁত খুব দামী জিনিস। এ দাঁত থেকে ভাল ভাল কৌটা ও খেলনা প্রভৃতি তৈরী হয়। আমরা দাঁত দিয়ে চিবোই। হাতী কিন্তু এই বড় দাঁত দিয়ে মোটেই চিবোয় না; চিবোনোর দাঁত থাকে তার মুখের ভিতরে।

হাতীর মাথা ও মুখ থেকে নীচের দিকে বেরিয়েছে লম্বা শুঁড়। এই শুঁড় হাতীর হাত, নাক ও কিছুটা মুখের কাজও করে। শুঁড় দিয়ে হাতী গাছের ডালপালা ভেঙে মুখে পুরে দেয়। শুঁড় দিয়ে সে শ্বাস নেয়, গন্ধও নেয়। আবার শুঁড় দিয়েই জল টেনে নেয়। সূঁচের মতো ছোট জিনিসও সে শুঁড় দিয়ে মাটি থেকে তুলে নিতে পারে।

অত বড় হাতীর দেহ। গায়ে তার জোরও ভীষণ। কিন্তু তাহলেও খুব শান্ত আর নিরীহ সে। পুষলে হাতী মানুষের পোষ মানে। গাছের কচি ডালপালা আর নানারকম শস্য খেয়ে হাতী বেঁচে থাকে। সে কখনো মাংস ছোঁয় না। এক একটা হাতী বাঁচে প্রায় দেড়শ' বছর।

বাঘ—বাঘের চেহারা খানিকটা বিড়ালের মতো; তবে বিড়ালের চেয়ে অনেক বড়। বাঘ লম্বায় প্রায় ৬-৭ হাত হয়



এবং দু' হাতেরও উপর উঁচু হয়। গায়ের রঙ হলদে, তার ওপর কালো কালো ডোরা; পেটের রঙ সাদা ও ডোরা-বিহীন। বাঘের মুখেও বিড়ালের মতো গোঁফ আছে।

বাঘ ভীষণ হিংস্র প্রাণী। ছোট বড় কোনো প্রাণী শিকারই সে বাদ দেয় না। যেমন মারে হরিণ ছানা, তেমনি বুনো মোষের ঘাড়েও সে লাফিয়ে পড়ে। বাঘের দাঁতে ও থাবায় ভীষণ জোর। বাঘের দেহে এত শক্তি যে, বড় বড় গরু-মোষ সে অনায়াসেই পিঠের উপর ফেলে পালিয়ে যায়। বড় বড় নদী সে সহজেই সাঁতরে পার হতে পারে। পশুদের মধ্যে বাঘ-ই সবচেয়ে সাহসী।

বাঘ বাস করে জঙ্গলে। মাঝে মাঝে শিকারের আশায় জঙ্গল থেকে বাঘ রাতের বেলায় লোকালয়ে আসে। বাংলাদেশের সুন্দরবনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাঘ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' আছে। তারা যেমন বড়, দেখতে তেমনি সুন্দর, আর তেমনি ভয়ঙ্কর তাদের স্বভাব।



সিংহ—বাঘের মতোই ভয়ঙ্কর আর হিংস্র হলো সিংহ। সিংহের গায়ের রঙ পাটকিলে। তার দাঁত আর নখ খুব ধারালো এবং জোরালো। গায়েও তার ভীষণ শক্তি। তার থাবার ঘায়ে গরু বা মোষের মাথার খুলি অবধি ভেঙে যায়।

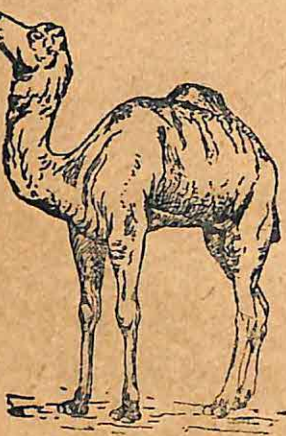
সিংহের কোমরের দিকটা খুব সরু। পুরুষ সিংহের ঘাড়ে লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া চুল হয়। ঐ চুলকে বলে সিংহের কেশর।

সিংহকে বলে **পশুরাজ**। যেমন চেহারা, তেমনি মেজাজ।

শিকার যদি পছন্দ না হয় তবে সেই রাগে সে ভীষণ শব্দে ডাকতে থাকে। সেই ডাকে বনের জন্তু-জানোয়ার ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। তখন সে পছন্দমতো জন্তু দেখে তার উপর লাফিয়ে পড়ে।

সিংহের ডাক শুনলে তোমাদেরও বুক কেঁপে উঠবে—এমন ভীষণ তার গলার আওয়াজ! সিংহের ডাককে বলে সিংহের গর্জন।

উট—মরুভূমির দেশ। সেখানে জল নেই, গাছপালা নেই, ধু-ধু করছে শুধু বালি। দিনে রোদের তাপে বালি আগুনের মতো তেতে ওঠে, তখন সেখান দিয়ে কেউই হাঁটতে পারে না; পারে শুধু একটিমাত্র প্রাণী—তার নাম হল উট। উটের পিঠে চড়ে মানুষ মরুভূমি পার হয়, তাই উটকে বলা হয় 'মরুভূমির জাহাজ'।



উট কিন্তু দেখতে বড় কুৎসিত। লম্বা লম্বা পা, লম্বা গলা, অথচ ছোট একটুখানি মাথা; বিরাট একটা শরীর আর পিঠের উপর একটা বিরাট কুঁজ—সব মিলিয়ে অদ্ভুত চেহারা উটের।

উটের যেমন চেহারা, তেমনি মেজাজ। মেজাজ ঠিক না থাকলে সে পথ চলবে না, মারতে মারতে মেরে ফেললেও সে বালির উপর শুয়ে থাকবে। তখন নানা বুদ্ধি খেলিয়ে তাকে ওঠাতে ও চালাতে হয়। তবে এমনিতে উট খুব শান্ত আর নিরীহ। খুব কষ্ট সইতে পারে সে। মরুভূমিতে জল নেই, খাবার নেই, তবুও সে দিনের পর দিন পিঠে বোঝা নিয়ে মরুভূমি পার হয়। তার পেটে একটা বাড়তি থলি আছে।

সেই থলিতে সে জল জমিয়ে রাখতে পারে। মরুভূমিতে যখন জল পাওয়া যায় না, সে তখন সেই জল খেয়ে বেঁচে থাকে। গাছের ডালপালা ও পাতাই হল উটের প্রধান খাদ্য। খেজুর খেতেও সে খুব ভালবাসে।

পাখির কথা

মাঠে, ঘাটে, বনে, জঙ্গলে, আমাদের বাড়িতে, বাড়ির আনাচে-কানাচে কত রঙ-বেরঙের পাখি আসে। তারা চরে বেড়ায়, বাসা বাঁধে। তোমরা রোজ তাদের নেমন্তন্ন করবে, খেতে দেবে সব রকমারি খাবার—খুদ, কলাই, পোকামাকড়। দেখবে দল বেঁধে তারা আসবে; আসবে সব কাক, চড়াই, পায়রা, শালিক, আরও কত পাখি।

চড়াই—ছোট পাখি, বড় জোর পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু ভারী ছটফটে আর ঝগড়াটে। তার ঠোঁট ছোট আর মজবুত। পায়ের আঙুল চারটে—তিনটে সামনের দিকে আর একটা পিছনে। প্রত্যেক আঙুলে নখ আছে।



সোজাভাবে চড়াই উড়তে পারে না, ঢেউ-এর মত উঁচু-নীচু হয়ে ওড়ে। চড়াই কখনও পোষ মানে না। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের আশেপাশে থাকতে সে ভালবাসে।

চড়াই খায় অনেক কিছুই—ধান, চাল, কলাই, ইত্যাদি। আমাদের ঘরের ভিতর, কড়িকাঠের নীচে, দেওয়াল ও চালের ফাঁকে অথবা কাছাকাছি কোন জায়গায় সে বাসা বাঁধে; ঘাস, খড়

প্রভৃতি দিয়ে সে তৈরি করে বাসা। সেখানে মেয়ে চড়াই একেবারে তিনটা থেকে পাঁচটা ছাই রঙের ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে পরে ছানা বেরোয়।

কাক—কাক দেখেনি, এমন লোক জগতে বিরল। দিন-ভোর তাদের 'কা-কা' ডাকে কান পাতা দায় হয়। গলার আওয়াজ তাদের ভারী কর্কশ।

কাকের ঠোঁট কালো, মজবুত, লম্বা ও ধারাল। প্রত্যেক পায়ে চারটে করে আঙুল—সামনের দিকে তিনটে, পিছনে একটা।

কাক আছে মোটামুটি দুই রকমের—**পাতিকাক ও দাঁড়কাক**। পাতিকাকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। পাতিকাক আকারে ছোট।



চালাকিতে পাতিকাকের জুড়ি মেলা ভার। ঘরের চালে বা পাঁচিলের উপর বসে সে চারিদিকে তাকাতে থাকে, সুযোগ পেলেই এমন কি ঘরের মধ্যে ঢুকে সে খাবার নিয়ে চম্পট দেয়।

কাক খায় না, এমন জিনিস জগতে খুব কম আছে। ভাল বা নোংরা কোন জিনিসই তারা বাদ দেয় না।

পাতিকাক দল বেঁধে বাস করে। গ্রামের বাইরে নিরিবিলি জায়গায় এক একটা বড় গাছে এক-এক দল কাক বাস করে।

ফাল্গুন মাস থেকেই তাদের বাসা বানাবার ধুম পড়ে। মেয়ে কাক সেই বাসায় তিনটা থেকে ছয়টা ডিম পাড়ে। ডিমগুলো হয় ফিকে নীল রঙের।

কাকের নিজেদের মধ্যে মিলমিশ ও একতা খুব বেশী। একটা কাক যদি বিপদে পড়ে, কাছাকাছি যেখানে যত কাক থাকে, সব সেখানে এসে জড়ো হয়, আর 'কা-কা' রবে গলা ফাটায়।

শালিক—শালিক তোমরা রোজই দেখে থাক। বাড়ির উঠানে, বাগানে, আনাচে-কানাচে তারা চড়ে বেড়ায়। তারা ভয়ানক ঝগড়াটে; অথচ মজা হল, তবু তারা দল বেঁধে বাস করে। ছোট বেলায় পুষলে শালিক বেশ পোষ মানে এবং শিখালে মানুষের মত কথা বলতে পারে।



তাদের শরীর কোথাও কালো, কোথাও সাদা, কোথাও বা গাঢ় খয়েরি রঙের। ঠোঁট, পা ও চোখের নীচেকার রঙ হলদে। তাই তাদের দেখতে মোটামুটি মন্দ নয়।

তাদের প্রধান খাদ্য পোকামাকড় হলেও অন্য জিনিসও তারা খায়। কিন্তু কাকের মত নোংরা জিনিস খায় না কখনও। বৈশাখ থেকে আষাঢ়ের কিছুদিন পর্যন্ত তারা বাসা বাঁধে। মেয়ে শালিক নীল রঙের তিন-চারটে ডিম পাড়ে সেই বাসায়।

অনুশীলনী

১। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী উপকারী? বাঘের মাসী কে? কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে কে বেশী উপকারী,—কেন? কুকুর ও বিড়ালের চেহারায় তফাত কি? গরু আমাদের কি কি উপকার করে? গরুর বাচ্চাকে কি বলে? কে জাবর কাটে?

২। একটি বন্যপশুর বিবরণ দাও। কাদের 'এক রা'? কোন্ পশুর গায়ে কাঁটা আছে? ওল, কচু খেতে কোন্ পশু ভালবাসে?

৩। কোন্ পাখিদের মধ্যে মিলমিশ সবচেয়ে বেশী? কোন্ পাখি ছটফটে ও ঝগড়াটে? কোন্ পাখি পোষ মানে? কোন্ পাখি সবচেয়ে বেশী চালাক? 'কাকের মত শালিকও সব জিনিস খায়।'—এটা কি ঠিক?

টুকরা সংগ্রহের বই, প্রকৃতি-পঞ্জী ও আবহাওয়া-পঞ্জী

টুকরা সংগ্রহের বই—শুধু বই পড়লে ভূগোল ও বিজ্ঞান ঠিকমতো শেখা যায় না। ঠিকমতো শিখতে হলে হাতে-কলমে কাজ করা দরকার। তাতে আনন্দও আছে। বই পড়ার পর কি কি তোমাদের করতে হবে, সংক্ষেপে তাই বলছি। নানা রকম পাতা, নানা রঙের নানা আকারের ফুল, ফল, সব তোমাদের নজরে পড়ে। রঙ-বেরঙের পাখি ওড়ে চারপাশে। এদের কথা তোমরা খাতায় লিখে রাখবে। এজন্য কয়েকখানা খাতা তৈরি করবে। তাদের মলাটের উপর লিখবে—পাখির বই, পাতার বই, ফুলের বই, ফলের বই ইত্যাদি।

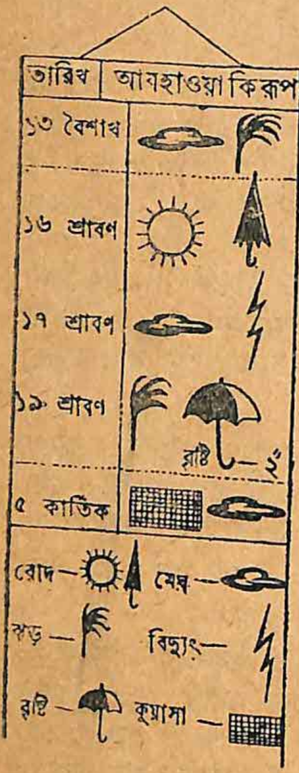
পাখির বইতে থাকবে পাখির পরিচয়—তাদের চেহারা, গায়ের রঙ, আকার, কোন্ সময় তাদের দেখা যায়, তারা কি খায়, ইত্যাদি। তাদের পালক আঠা দিয়ে এঁটে রাখবে খাতার মধ্যে।

এইভাবে পাতার বইতে পাতার কথা লেখা থাকবে। ফুল ও ফলের বইতে থাকবে ফুল ও ফলের কথা।

প্রকৃতি-পঞ্জী—বছরের এক-এক সময়ে এক-এক রকম ফুল-ফল, পোকা-মাকড়, পশু-পাখি তোমাদের নজরে পড়ে। এসব তোমরা ভালভাবে লক্ষ্য করবে। কোন্ দিন কে কি দেখল, তার পঞ্জী তৈরি করবে। প্রথমে কার্ডবোর্ডে কাগজ এঁটে নেবে। সেই কাগজে ঘরও কাটা থাকবে। যে যখন যা দেখবে, তা লিখে রাখবে সেই ঘর-কাটা কাগজে। কিভাবে লিখবে তার একটা নমুনা নীচে দেখ—

কি দেখেছে	কে দেখেছে	কোন্ দিন দেখেছে	কোথায় দেখেছে
কদম ফুল	...... কালু	১১-৪-৬২	পাঠশালার বাগানে
শুঁয়োপোকা	...... ভোম্বল	১৬-৪-৬২	কুলগাছটার ডালে

আবহাওয়া-পঞ্জী—বছরে ছয় ঋতু। এক-এক ঋতুতে দেশের অবস্থা হয় এক-এক রকম। কোন সময় প্রচণ্ড রোদ পড়ে। কোন সময় মেঘে মেঘে আকাশ কালো হয়, ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। কোন সময় আবার কুয়াশায় ঢেকে যায় সর্বদিক।



আবহাওয়ার এই সব অদ্ভুত পরিবর্তন তোমরা লক্ষ্য করবে। কোন্ দিন আবহাওয়া কি রকম ছিল, তা লিখবে খাতায়। এইভাবে তৈরী হবে তোমাদের আবহাওয়া-পঞ্জী। ছবি এঁকে রোদ, ঝড়, মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, কুয়াশা, ইত্যাদি বুঝাবার চেষ্টা করবে। পাশে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তা ভাল করে দেখ। তাহলে বুঝবে, তোমাদের কি করতে হবে।